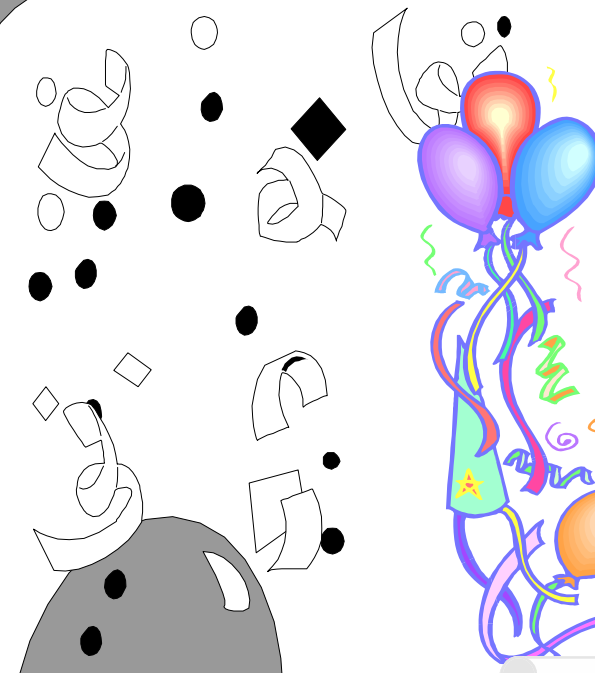

Merry Christmas and Happy New Year

to all of our members, friends, advertisers and well-wishers for their heartily co-coperation.

বড়দিন ও
নববর্ষের শুভেচ্ছা

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, USA

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box-1258 Madison Square Station, New York, NY 10159-1258 USA
Phone: 646-773-7790 917-767-4632 Email: probashi051601@aol.com
President: Mr. Simon Gomes General Secretary: Mr. Joseph D' Costa
Registered non-profit organization for NY NJ & CT.

SOURCE AND SOLUTIONS INC. (COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box- 3691 Grand Central Station, New York, NY 10163-3691 USA
Phone: 609-936-1194 718-429-3971
President: Mr. Norbert Mendes General Secretary: Mr. Paul B. Bala

---

ICHAMOTI BANGLADESHI CHRISTIAN ORGANIZATION OF NORTH CAROLINA
1112 Open Field Drive, Gamer, NC 27529
Phone : 919-556-5464 919-876-6916 Email: ichamoti@excite.com
President: Mr. Francis T. Gomes General Secretary: Mr. Augustine A. Gomes

---

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
743 Northampton Drive, Silver Spring, MD 20903 USA
Phone : 301-439-7541 Email: imukti@yahoo.com
President: Mr. Simon Pereira General Secretary: Mr. Bablu Rozario

CHRISTIAN JUBO SHAMAJ
1350 Windmill Lane, Silver Spring, MD 20905, USA
Phone: 301-384-4921 301-431-1942 Email: ustadzee@yahoo.com
Contact: Mr. Collins Gomes Mr. Samual D'Costa

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE SOCIETY
808 Cannon Road, Silver Spring, MD 20904
Phone: 301-879-3108 301-431-3133
President : Mr. Subash C. Rozario General Secretary : Mr. Felix Gomez

---

CANADA:

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO, CANADA
13 Willow Park Drive, Brampton, ON L6R 2M9, CANADA
Phone: 905-790-1639 416-757-5958 Email: bcao98@aol.com
President : Mr. Dominic Rozario General Secretary: Mr. Augustine P. Gomes

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO, INC.
155 Linden Avenue, Toronto, ON M1K 3J1, CANADA
Phone: 416-267-5221 416-691-3153 Email: bccso2000@hotmail.com
President: Dr. David H. Mazumdar Gen. Secretary: Mr. Gabriel S. Rozano

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF CANADA, MONTREAL
805 Boul. Ste. Croix
St. Laurent, Montreal, Quebec, QC H4L 3X6 CANADA
Phone: 514-748-2762
Acting President: Mr. Sunil Gomes General Secretary: Mr. William Gomes

---

BERMUDA:

BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Vally Road
Pambrook HM 12 Hamilton, BERMUDA
Phone : 441-296-8336 441-296-6587
President: Mr. Robin Deesa General Secretary: Mr. Patrick Gomes

PBCA EXECUTIVE BOARD MEMBERS:

PRESIDENT	: MR. SIMON GOMES
VICE-PRESIDENT	: MRS. PROVA GONSALVES
GENERAL SECRETARY	: MR. JOSEPH D. COSTA (BIKASH)
JOINT SECRETARY	: MR. WILLIAM GOMES (POLASH)
TREASURER	: MR. PATRICK ROZARIO (RONJON)
JOINT CULTURAL SECRETARY	: MRS. ANILITA COSTA (NOMITA)
JOINT CULTURAL SECRETARY	: MR. LITON GREGORY
ORGANIZING SECRETARY	: MRS. BERNADETTE GOMES (TILU)
YOUTH & SPORTS SECRETARY	: MR. RONI GOMES
EXECUTIVE MEMBER	: MR. RICHARD BISWAS
EXECUTIVE MEMBER	: MR. SEBASTIEAN ROZARIO

BOARD OF ADVISORS:

FR. STANLEY GOMES
MRS.AGATHA DIPTI GOMES
MR. ANTHONY GOMES
MR. ANTHONY BIMAL GOMES
MR. ARUN PEREIRA
MR. ARUP MARK MODHU
MR. BENJAMIN ROZARIO
MR. CLEMENT BADAL ROZARIO
MR. DOMINGO ANIL GOMES
MR. GABRIEL D' CRUZE
MR. GERALD GOMES
MR. JOSEPH PRODIP DAS
MR. JULIOUS HALDAR
MR. JUSTIN ROZARIO
MR. LOUIS SUBIR ROZARIO
MRS. MABEL QUIAH
MR. NIRMAL GOMES
MR. NORBERT MENDES
MR. PAUL BALA
MR. RAYMOND GOMES
MR. ROBERT GOMES
MRS.SHILA ROZARIO

ADDRESS : PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station
New York, NY 10159-1258
PHONE :201-420-1826 718-805-4941
646-773-7790 917-767-4632

সম্পাদকঃ
যোসেফ ডি. কস্তা (বিকাশ)

সহকারী সম্পাদকঃ
সুবীর এল রোজারিও
সেবাষ্টিয়ান পঙ্কজ রোজারিও

প্রচ্ছদ ঃ মার্ক হাওলাদার (রনি)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
ডমিনিক গমেজ, কানেকটিকাট
ফ্রান্সিস সরকার
রিচার্ড গমেজ, ক্যালিফোর্নিয়া
নরবার্ট জি. মেন্ডেজ, নিউজার্সি
বিলাস রোজারিও, নিউজার্সি
যোসেফ প্রদীপ দাস, নিউজার্সি
রনি গমেজ, নিউজার্সি
বেঞ্জামিন রোজারিও, নিউজার্সি
প্যাট্রিক রোজারিও, নিউইয়র্ক
ডেরিক গন্‌ছালভেস, নিউইয়র্ক
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, নিউইয়র্ক
আগষ্টিন জীবন গমেজ, নিউইয়র্ক
শিলা রোজারিও, নিউইয়র্ক
ডোমিঙ্গো অনিল গমেজ, নিউইয়র্ক
অনিল রোজারিও, নিউইয়র্ক
এ্যান্থনী বিমল গমেজ, নিউইয়র্ক
দিলীপ গমেজ, নিউইয়র্ক
দিপ্তী গমেজ, নিউইয়র্ক

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনায়ঃ
প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ইন্‌ক।
পি.ও. বক্স - ১২৫৮
নিউইয়র্ক, এন ওয়াই -১০১৫৯-১২৫৮
ইমেইলঃ Probashi051601@aol.com
ফোনঃ (646) 773-7790, (917) 767-4632

প্রিন্টিংঃ
কালারগাইড প্রিন্টিং প্রেস
(৭১৮) ৪৩৩-০৪৫০, (৯১৭) ৯৭৫-৫৫৫১
কম্পোজ ও গ্রাফিক্সঃ
রাশেদ আনোয়ার (৯১৭) ৮২৫-৩৩০২

সূচীপত্র

প্রবাসীর শুভেচ্ছা ১
খ্রীষ্টান অর্গানাইজেশন্‌স ইন নর্থ আমেরিকা ২
প্রবাসীর সদস্য মন্ডলীর তালিকা ২
উপদেষ্টা মন্ডলীর তালিকা ২
সূচীপত্র ৩
সম্পাদকীয় ৪
কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলীর পত্র ৫
সভাপতির বাণী ৬
সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে ৭
শুভেচ্ছা বাণী - নরবার্ট জি. ম্যান্ডেজ ৮

প্রবন্ধঃ

"বড়দিনের হারানো সেদিনের কথা" ৯
বড়দিন ঃ সকলকে ভালবাসার ও ক্ষমা করার দিন ১৩
For Immigrant Families (Times News) ১৫
আহ্বান ১৭
বড়দিনের প্রস্তুতি ১৯
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মটোরোলা ২০
Perspectives on Education in Bangladesh ২১
দাম্পত্য কলহঃ শতাব্দীর লালিত ও লুকায়িত এক সামাজিক সমস্যা ২৫
Family, Faith and Community in our Lives ২৭
Suffering ৩১
মুক্তিযুদ্ধে বাঁশের বাঁশীর সুর ৩৩
Being a Bengali Christian in the United States ৩৫
Conflicting Cultures ৩৭
My Bengali Life ৩৯
The Terror Trip ৪১
আর্মানিটোলার আর্মেনিয়ান সাহেব ৪৩
দাদুর সলা (এক) ৪৫
'সর্বকণ্ঠী শত্রু ক্রোধ' এবং সুস্থ থাকা ৪৯
এই হতশ্রী সময়ে ৫৩
সুখ ৫৭
"একটু জেনে নিন" ৫৭
"জেনে রাখা ভাল" ৫৭

সূচীপত্র

(...ক্রমশ)

ঋতুর আনন্দধারা ও প্রবাসী ৫৯
"ফিরে আসা বন্ধনে" ৬৩
তোমাকে ৬৭
বঙ্গে পর্তূগীজ প্রভাব - নতুন উষার স্বর্ণদ্বার ৭১

কবিতাঃ

Celebrate Christmas & A Happy New Year ৭৭
জীবনের ডাক ৭৭
ওগো বনফুল শিখাও মোদেরে ৭৮
রূপ এক স্বরূপে ভিন্নতা ৭৮
সেই রাতের কথা ৭৯
সান্ত্বনা ৭৯
ভাল লাগা ৭৯
Christmas is Here ৭৯
Art and Imagination ৭৯
মোদের রাজা ৮১
এখনোও ৮১
হেরোদের আত্মা ৮১
সহভাগিতা ৮১
সুবিবেচনা নির্বাসনে ৮১
অপেক্ষায় ৮২
আর্তনাদ ৮২
Winter ৮২
পন্ডিত মামা ৮২
কেউ ভিসা দেয়নি ৮৩
Christmas Poem ৮৩
Compare ৮৩
A Princess ৮৪

খবর ঃ

ইউনাইটেড বাঙ্গালী লুথারেন চার্চ ৮৭
যাদেরকে পেয়েছি ৯১
স্কলারশিপ লাভ ৯১
প্রবাসের দিনগুলো (চিত্রে) ৯৫

সম্পাদকীয়

আমরা নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান ভাইবোনদের প্রচেষ্টায় 'তেপান্তরী' বড়দিন সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত। একটি সুশীল সমাজের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে 'তেপান্তরী'র ভূমিকা অনন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা নানাভাবে আমাদের এ পত্রিকাটিকে অলংকৃত করতে চেষ্টা করেছি–প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, শুভেচ্ছা ও বিজ্ঞাপন সামগ্রীর আলপনায়। এরই মাঝে হয়তো কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি হয়েছে। আপনাদের অফুরন্ত ক্ষমার একটু অংশ আমাদের আরো উৎসাহিত করবে আগামী দিনে সুন্দর পরিবেশনায়। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, ভালবাসা আর্থিক অনুদান ও সুনিপুন কারুকার্যে আজকের এ 'তেপান্তরী' বড়দিন সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদের সকলকে আমার অবনত প্রনাম। আগামী দিনগুলোতেও আপনাদের অকৃপন ভালবাসা আমাদেরকে সাফল্যমন্ডিত করবে।

আমরা সকলেই অবহিত আছি যে, বড়দিন হচ্ছে আনন্দের দিন, মিলনের দিন, আসুন, আমরা আমাদের ভুলত্রুটি, দুঃখ–বেদনা, হিংসা–বিদ্বেষ ভুলে একে অন্যের হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ ও হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে, আমাদের সকলের ত্রানকর্তা শিশু যীশুকে গ্রহন করি। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত ভাই বোনদের হৃদয় উদ্বেলিত হোক আমাদের এ প্রকাশনায়। পরিশেষে আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। বড়দিন ও নববর্ষ আপনাদের সকলের জীবনে বয়ে আনুক অফুরন্ত প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা।

– ধন্যবাদ

JOSEPH CROWLEY
7TH DISTRICT, NEW YORK

COMMITTEE ON
FINANCIAL SERVICES

SUBCOMMITTEE ON CAPITAL MARKETS, INSURANCE AND GOVERNMENT SPONSORED ENTERPRISES

SUBCOMMITTEE ON FINANCIAL INSTITUTIONS AND CONSUMER CREDIT

SUBCOMMITTEE ON OVERSIGHT AND INVESTIGATIONS

COMMITTEE ON
INTERNATIONAL RELATIONS

SUBCOMMITTEE ON MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA

SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL TERRORISM, NONPROLIFERATION AND HUMAN RIGHTS

CHIEF DEPUTY WHIP

NEW DEMOCRAT COALITION

E-MAIL
write2joecrowley@mail.house.gov

INTERNET WEB PAGE
http://www.crowley.house.gov

Congress of the United States
House of Representatives
Washington, DC 20515–3207

December 11, 2003

Dear Friends:

It is my pleasure to join you in celebrating the holidays at the Probashi Bengali Christian Association's Christmas program.

One of the real joys of the holiday season is the opportunity for the community to come together and celebrate this special time of the year. There is no better occasion than this to express our warm appreciation for our family, friends and neighbors. It is truly heart-warming to see the Bangladeshi Christian community here in Queens enjoying the holidays together.

I look forward to continuing my work with the Bangladeshi community in the new year. I also want to extend my warmest thoughts and wishes for a wonderful holiday season and I hope that the coming year will bring peace, good health, good cheer and prosperity for all of you.

Sincerely,

Joseph Crowley
Member of Congress

WASHINGTON OFFICE:
312 CANNON HOUSE OFFICE BUILDING
WASHINGTON, DC 20515
(202) 225–3965

BRONX OFFICE:
3425 EAST TREMONT AVENUE, SUITE 1–3
BRONX, NY 10465
(718) 931–1400

QUEENS OFFICE:
82–11 37TH AVENUE, SUITE 705
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
(718) 779-1400

CO-OP CITY OFFICE:
177 DREISER LOOP, ROOM 3
BRONX, NY 10475
(718) 320–2314

সভাপতির বাণী

কালচক্রের আবর্তে বছর ঘুরে আবার এসেছে বড়দিন। প্রভু যীশুর জন্মদিন। পাপের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি অর্জনের দিন। মানবজাতির মুক্তির ইতিহাসে বড়দিন এক অতি অবিস্মরনীয় ঘটনা, এক রহস্যে আবৃত এক ঐতিহাসিক দিন। এদিনে ঈশ্বর পুত্র মানবদেহ ধারন করেন। স্বর্গের স্বর্ন সিংহাসন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টের মর্ত্যে আগমন হলো মানবজাতি ও ঈশ্বরের মধ্যে এক মিলন–সন্ধি স্থাপন। এই সন্ধি হলো মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার করে পুনর্বার ঈশ্বর অভিমুখী করা।

তাঁর জন্মের মধ্য দিয়ে অশান্ত ও পাপ–পঙ্কিলময় পৃথিবীতে স্থাপিত হলো পরম শান্তি, মানুষে মানুষে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রেম। আমাদের প্রবাসী সমাজে সকলের মাঝে শান্তি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করুক আজকের দিনে এই মোর প্রার্থনা। এই একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকার বুকে প্রথম বাঙালী খ্রীষ্টান সম্মেলনের আয়োজন করে। সমাজবাসীর দৃষ্টিতে ও মূল্যায়নে উক্ত সম্মেলন ছিল সফলতায় ও স্বার্থকতায় ভরা। এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের অংশগ্রহন ছিল এক গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। যাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতাদানে সম্মেলন সফল হয়েছে প্রভু যীশুর জন্মতিথিতে আমি তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কামনা করি প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ।

আসুন, বড়দিনে আমরা বাহ্যিক আনন্দের জোয়ারে ভেসে না গিয়ে আত্মিক সমৃদ্ধি অর্জন করি। এই সমৃদ্ধি আসবে হিংসা–দ্বেষে নয়, প্রেম–ভালবাসায়; পরশ্রীকাতরতায় নয়, পরোপকারে; প্রতিশোধে নয়, ক্ষমায়। তবেই তো আমরা লাভ করতে পারব স্বর্গীয় পিতার পরম সান্নিধ্য।

পরিশেষে সকলকে জানাই বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে

Simon Gomes

সাইমন গমেজ

সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে

প্রবাস জীবনে বাংলা সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন অগ্রন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের নব প্রজন্মকে আমাদের স্ব–সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সেগুলো চর্চা ও ধারন করার শুরু দায়িত্ব আজ প্রবাসীর। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই আমরা বিগত বছরে বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, প্রশংসা কির্তন, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাটে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ, তেপান্তরীর বড়দিন সংখ্যা, বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিওকে অভ্যর্থনা ও ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করেছি। বিগত বছরগুলোর ধারাহিকতায় প্রতিটি অনুষ্ঠানই সুন্দরভাবে আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত।

বিগত সময়ের কার্যক্রমগুলো সফল ও সুন্দরভাবে আয়োজন করতে যারা আমাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। সেই সাথে প্রত্যাশা থাকছে আগামী দিন গুলোতেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতির। সেই সাথে প্রার্থনা করি, যেন প্রতিটি প্রবাসী পরিবার হয়ে উঠে আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবার। প্রতিটি দ্বারে দ্বারে বয়ে যাক শান্তি ও ভালবাসার অফুরন্ত ধারা। সকলকে শুভ্র বড়দিন ও নববর্ষ।

শুভেচ্ছান্তে

Joseph D'costa

যোসেফ ডি. কস্তা (বিকাশ)

শুভেচ্ছা বানী

'ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁতে বিশ্বাস করে। সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরন করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রান পায়।'

– 'যোহন ৩ অধ্যায় ১৬ ও ১৭ পদ'

সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও এই সুন্দর পৃথিবীকে যারা আরও সুন্দর ও শান্তিময় করার জন্য বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে তাদের জানাই অভিনন্দন। জগতের ত্রানকর্তা প্রভু যীশুর এ জন্মতিথিতে তাঁর মুক্তির বারতা বয়ে আনুক আমাদের সকলের জীবনে শান্তি, আনন্দ ও প্রাচুর্য।

সুন্দর কলেবরে তেরতম 'তেপান্তরী' প্রকাশনাকে জানাই অভিনন্দন।

সোর্স এন্ড সলিউশন ইনক এর পক্ষ হতে সকলকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

নরবার্ট জি ম্যান্ডেজ
সভাপতি
সোর্স এন্ড সল্যুশনস ইনক, নিউইয়র্ক।

"বড়দিনের হারানো সেদিনের কথা"

ডেভিড স্বপন রোজারিও, টরেনটো, কানাডা

সবেমাত্র "বর্গাবর্গী" শেষ করে এসে শুয়েছি। "জাহুরের" তীব্র শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে সময়ে আমরা এডুদার নেতৃত্বে বর্গাবর্গীতে যেতাম। কণ্ঠে সুর ছিল "বর্গাবর্গী যাবনা, ত্রাণকর্তার আগমন।" একটা ছোটখাট কীর্তন দলের মত, আমরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে পিঠা তুলতাম। চিত্তই, কুলি, বড়া, বিবিখ্যা, ফিলিস, পাটিসাপটা, পাকনপিঠা ইত্যাদি কত বাহারি নাম। পাড়াঘোরা শেষে, একটি বাড়ীতে বসে গান ও প্রার্থনা করে; সে পিঠা ভাগ করে খেয়ে বাড়ী ফিরতাম। বারান্দার এক কোণে পড়া ও শোয়ার জন্য একটি রুম, আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। আসবাবপত্রের মধ্যে টেবিল, একটি চেয়ার ও খাট, তাতে একটি পাতলা কাঁথার উপর চাঁদর, একটি বালিশ ও শীত নিবারনের জন্য একটি মাত্র কম্বল-সম্বল, যা আজকের বিলাসী জীবনে কল্পনাও করা যায় না। ঘরে ঢোকার মুখে, একটি আলগা বেড়ার ঝাপ। ঝাপের মাঝামাঝি স্থানে, দড়ির ফাঁসের মধ্যে বাঁশ ঢুকিয়ে, আড়াআড়িভাবে ভেতর থেকে বন্ধ করা যেত। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। "দাঁড়িয়া" খেলার জন্য উত্তম দিন। মাত্র দুদিন আগে ভরা পূর্ণিমা গেছে, তাই চাঁদমামা, কিছুটা দেরি করে উঠেছেন। তারাভরা আকাশ, আলোর বিকিরণে ছেঁয়ে আছে, আর ঠিক তার মাঝে, চাঁদ যেন একটি রূপোর থালা। সে সময়, বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলি, সন্ধ্যাতেই মনে হত গভীর রাত। সমস্ত পাড়াগুলি নিঁঝুম হয়ে যেত। হারিকেন ও কুপিবাতি, কেরসিন সংকটে বা সাশ্রয়ের জন্য, অনাহুত কেউ জ্বালিয়ে রাখতনা। বাবা ছিলেন খুব রাশভারী। স্কুলে মাস্টারি করতেন বলে, সবকিছুতেই একটা নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সারাদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে কার্পাস তুলোর মত উড়ে বেড়ানো, মোটেই পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে, প্রথমে স্বস্নেহে উপদেশ, মৃদু তিরস্কার, পরে রীতিমত বকুনি বর্ষিত হত আমাদের উপর। তদুপরি, মাঝরাতে খেলার নামে রাত্রি জাগরণ, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আবারও "জাহুর" এবার গলাটা স্পষ্ট চিনলাম,- আমারই বাল্যবন্ধু বার্নাড, সংক্ষেপে সবাই "বার" বলে ডাকে। সে সময়, খেলার সাথীদের এভাবে বাড়ী থেকে খেলার স্থানে ডেকে নেওয়া হত।

একজনে জোরে জোরে বলত "আম পাতা চিরল চিরল, কাঁঠাল পাতা গোল, অমুকে যে শুইয়া রইছে -------- তোল রে," বলার সাথে সাথে, উপস্থিত সকলে সমবেত কণ্ঠে হো, হো, হোই করে চিৎকার করে উঠত। মনতো আর বেঁধে রাখা যায়না। কানখাড়া করে বাবার নাসিকা গর্জন শুনতে পেলাম। নিঃশব্দে বেড়ার ঝাপটা খুলে, চাদর দিয়ে আচ্ছা করে মাথা ও কান ঢেকে, খালি পায়ে, পা টিপে টিপে, ঘর থেকে বের হলাম। ভুলু সামান্য শব্দেই বেরসিকের মত ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো। কিন্তু অতিমাত্রায় প্রভু ভক্তির কারণে, আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইলো না, ধমক দিয়েও যখন কাজ হলোনা, ঢিল মেরে সঙ্গ ছাড়া করলাম। গালার পারে কস্তাদের বাঁশঝাড়। সেখানে বার ভুতের নাকি আস্তানা। দিনের বেলাতেও গাঢ় অন্ধকারে ছেঁয়ে থাকে। বাঁশঝাড়ের নীচ দিয়ে আসার সময়, অজানা ভয়ে গায়ে শিহরণ জাগে। অনেকে গভীর রাতে এখানে ভুতের খপ্পরে পরে কোনমতে প্রাণে বেঁচেছে, এ ধরণের নানা রোমহর্ষক ঘটনা-রটনা হয়ে, জায়গাটাকে কুখ্যাত করে তুলেছিল। গালার পারের কাছাকাছি আসতেই, মাতালদের নেশাজড়িত কণ্ঠের গান ভেসে এল, "মদ কি মজার চিজ, বানাইয়াছে জগদীশ, আমারে একটু বেশী দিস্ , কমদিস্ নারে।"

আজ "কচুধার", বড়দিনের আগের দিন, তাই সন্ধ্যা থেকেই আসর জমজমাট। কাকা গুলশানে এক সাহেবের বাড়ীতে কাজ করেন। ভীষণ ফূর্তিবাজ লোক। শনিবার বাড়ী ফেরেন, রোববার সাপ্তাহিক ছুটি। শনিবার রাতটা কাকার জন্য সব সময় উৎসবের দিন। সারাসপ্তা বিদেশী মদ, কিছু কিছু জমিয়ে একটি বোতলে নিয়ে আসেন, বাহারি নাম "ককটেল"। সাথে দেশী মদও থাকে। সে লোভে যদু, মধু ও কদুরা এসে ভীর জমায়। মানুষের মুখে মুখে, এর নাম হয়েছে "ককটেল পার্টি"। কাকাই আসরের মধ্যমণি। নানা তোষামদি কথা বলে, তারা কাকাকে তৃপ্ত করে। কাকিমা শুকরের ভুনা যত্ন করে রান্না করেন। সমান তালে তা চলতে থাকে, মধ্যরাত পর্যন্ত। সেই সাথে- বেতাল গান ও ঢোলের বাজনা। 'বর্গাবর্গী' করে ফেরার পথে উঠানে দাঁড়িয়ে গান শুনেছিলাম। তখনকার গানে একটা তেজছিল, উচ্চারণগুলোও বেশ স্পষ্ট ছিল, এমনকি ঢোলের শব্দে সুন্দর তাল ছিল। সমবেত কণ্ঠে তারা গাইছিল "জলে ভরে, ভরেরে, দশটি জালা জলে ভরে", কানান নগরের বিবাহ বাটিতে, মা-মারিয়ার অনুরোধে, যীশুর প্রথম আশ্চর্য্য কাজ, জলকে দাক্ষারসে পরিণত করাটা, মদের আসরকে হালাল করার একটি অজুহাত মনে হত আমার কাছে।

"দাঁড়িয়া কোটে" এসে দেখলাম, খেলার জন্য সবাই প্রস্তুত। অনেকে শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে, চাদরটাকে বিশেষ কায়দায় শরীরে পেঁচিয়ে নিয়েছে। পিয়াজ বোনার জন্য প্রায় তৈরী একটি জমিতে খেলার আসর বসেছে। খেলা যখন ভাঙ্গলো, তার অনেক আগেই শুভেচ্ছা বিনিময় করতাম। সে সময় কীর্তন প্রতিযোগিতা আজকের মত ঘটা করে অবশ্য হতনা, তবে কীর্তন দল ছিল, তারা গলায় হারমনিয়ম ঝুলিয়ে, খোল-করতাল, কাসার ঘন্টা বাজিয়ে "দুয়ারে দুয়ারে গাহিয়া বেড়াই, নবজনমের বাণী", প্রভুযীশু খ্রীষ্টের বার্তা, ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু আমাদের আগ্রহ ছিল অন্যদিকে, বড়দিনের নাটক, মার্ক ডি' কস্তার রচিত "গলিয়াদ বধ" বিশিষ্ট অভিনেতা সিলভেস্টার রিবেরু নাটকের নায়ক ও পরিচালক। মিঃ তার্সিসিয়াস ডি'কস্তার নেতৃত্বে, প্রাইমেরী স্কুলের পাশেই নাটকের মঞ্চ, মধ্যরাত পর্যন্ত, অত্যন্ত দক্ষভাবে তৈরী করা হয়েছে। প্রথম দিনের নাটক শুরু হতে বেশ দেরী হয়ে যেত, কারণ ঢাকা থেকে মেকআপম্যান ও ড্রেস আসতে। তখন যাতায়াত ব্যবস্থা একমাত্র ট্রেনই ভরসা ছিল। সেই ট্রেন কখনই সময়মত চলত না, প্রায়শই দেরী হত। দ্বিতীয় দিনে বেশ বেলা করে নাটক মহিলাদের জন্য শুরু হত। পুরুষ শাসিত সমাজে দ্বিতীয় দিনেও পুরুষ দর্শকরা ভীড় জমাত। বিনে পয়সার নাটক তখনকার একমাত্র বিনোদন ছিল। আজকালকার মত দৃশ্যানুযায়ী আলোকসম্পাত ছিল না, ছিল না মঞ্চে কোন মাইক বা সাউন্ড সিস্টেম।

হ্যাজাক লাইটের আলোতে আলোকিত হত মঞ্চ। দর্শকদের জন্য সামিয়ানার নীচে কয়েকটি হ্যাজাক বাতি জ্বলতো। মাঝে মাঝেই সমঝদাররা চিৎকার করে উঠতেন, "ঐ মন্টু, লাইটের পাম্প গেছেগা, পাম্প দে।" ড্রপসিন পরার সাথে সাথে বিপুল উৎসাহে, হ্যাজাক বাতি নামিয়ে সে পাম্প দিতে শুরু করত। অনেক সময় অতি উৎসাহে, গায়ের জোরে পাম্প দিতে গিয়ে ম্যান্টাল ফেলে দিয়ে, আয়োজকদের বিব্রত করতে দেখেছি। সে সময় আমাদের রাঙ্গামাটিয়া মিশনে পুরুষরা মহিলাদের পাঠ করতেন। অবশ্য অভিনয় দক্ষতার জন্য কেউ সহজে বুঝতে পারতনা এ ভেদাভেদটা। যেহেতু মঞ্চে মাইক ছিলনা, পাঠকদের উচ্চ কণ্ঠে পাঠ বলতে হত। তারপরও অভিযোগ আসত আরও জোরে বলেন, শুনতে পাইনা। মহিলা ও বাচ্চাদের কিচির মিচির শব্দে, মুরুব্বী শ্রেণীরা প্রায়ই গম্ভীর কণ্ঠে ধমক দিতেন, এই চুপ করেন। কেউ একটু আগ বাড়িয়ে বলতেন, ভাল না লাগে বাড়ী চলে যান। ছোট বাচ্চাতো আর বাড়ী রেখে আসা যায়না। আবার নাটক দেখারও সখ আছে, ফলে কতক্ষণ চুপ থাকলেও আসর আবার গুলজার হয়ে উঠত ফিসফিসানি শব্দে। মহিলাদের ধমক দেওয়া সে সময় সহজ ছিল, ওরা কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেতনা। কিন্তু যারা "দারু" পান করে আসত, মনের ভাব এমন, মদই যদি খেলাম তবে মাতাল হবনা কেন? কারণে অকারণে, চিৎকার করে বাহবা দেওয়া, নেশায় ঢুলতে ঢুলতে, কারও উপরে গড়িয়ে পরে অযথা ঝগড়া বাধানোদের সামাল দিতে নেতৃস্থানীয়দের বেগ পেতে হত।

বড়দিনের পরদিন থেকে শরিক বা সামাজিকদের বাড়ী বাড়ী বৈঠকে যেতে হত। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসার এক মহামিলনের সুযোগ সৃষ্টি হত। উঠানে মাদুর বিছিয়ে সবাই একত্রে বসে গান ও প্রার্থনার পর থালা ভর্তি পিঠা দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। আমরা পাড়াময় ঘুরে বেড়াতাম এবং গুরুজনদের প্রণাম ও সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করতাম। সে সময় অনেকে ঘর সাজাতেন, বিভিন্নরকম রঙ্গীন কাগজের ঝালর কেটে, শিকল ও নিশান বানিয়ে। ঘরের পিরাগুলো সাইল মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপে ঝকঝকে - তকতকে করে তুলতো। সেই পিরায় "শুভ বড়দিন" বা নানা নাম না জানা ফুলের লতা-পাতা বানিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। তখনকার দিনে গ্রাম ছিল মানুষে ভরপুর। যারা শহরে চাকরি করতেন, প্রতি শনিবার সাপ্তাহিক ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসতেন। হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র যারা শহরে সপরিবারে বাস করতেন। তবে উৎসব-পার্বনে গ্রামের বাড়ীতে ঠিকই আসতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের "শহুইরা" বলতেন। তাদের চলনে বলনে, পোষাকে - আষাকে শহরের বাসিন্দা হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যেত। সকল দুঃখ-বেদনা ভুলে বড়দিনের উৎসবে আমরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতাম।

বড়দিনের সে অনাবিল আনন্দ আর খুঁজে পাইনি। কেবলই মনে হয়, চলতে চলতে পথে, কেন যে থমকে গেলাম। পরিবর্তনশীল- মনে বড়দিনের উৎসবময়তায় এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। অনেক বাড়ীতে দালান-কোঠা হয়েছে। রাস্তা-ঘাটের আমুল পরিবর্তন হয়েছে। নানা উৎসবে রেডিমেড উন্নতমানের ঘর সাজানোর সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। আগে অনেকের ক্রীস্টমাস ট্রি সম্বন্ধে ধারণা ছিলনা। আজ গ্রামে অনেক বাড়ীর ঘরের কোনে তা লাল-নীল বাতি দ্বারা সজ্জিত হয়ে শোভা বৃদ্ধি করে। অনেক বাড়ীতে কাগজের বানানো তারা উঁচুতে বৈদ্যুতিক আলোতে মিট্ মিট্ করে জ্বলতে থাকে। পরিশ্রম করে হাতে বানানো পিঠার পাশাপাশি, নানা রকম কেক সে স্থান ক্রমশই দখল করে নিচ্ছে। নানা রকম ফল যেমন কমলা, আপেল ইত্যাদি সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। আমরা বড়দিনে মোটা ধানের চালের ভাত, মাছ, মাংস, ডাল ও ভাজিতে তৃপ্ত ছিলাম। আজ গ্রামে প্রায় সবাই চেষ্টা করে অন্তত একটা দিন বিরানী বা পোলাও হোক। দেশী মদের জায়গায় স্থান নিয়েছে বিদেশী মদ, পান সুপারী ও ধুমপানের জন্য হুক্কা দিয়ে আপ্যায়নের ক্ষেত্রে এসেছে চা, কফি ও সিগারেট। কিশোর-কিশোরী "বর্গাবর্গী" করে এখনো, তবে কয়েক বাড়ী ঘুরেই ক্লান্ত হয়ে যায়।

যুবকরা নাকি লজ্জা পায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে পিঠা তুলতে। কীর্তন প্রতিযোগিতা হয় খুব ঘটা করে। কিন্তু আগের মত এক মিশন থেকে অন্য মিশনে যাওয়া হয় না, নানা ব্যস্ততার কারণে। সমাজ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম হয়ে গেছে। ফলে বৈঠকগুলো আগের মত জমজমাট হয়না। শান্তি আর আনন্দের অনুভূতি নিয়ে অন্তরলোক আলোকিত করে প্রতিবছরই উদ্‌যাপন করা হয় এই জন্মোৎসব, বড়দিন। খ্রীষ্টের জন্ম সংবাদের মাধ্যমেই জগতে ঘোষিত হয়েছিল- ত্রাণকর্তার আগমণ সংবাদ। আর এ সংবাদ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আজ বিশ্বের সর্বত্র বড়দিন অতি পরিচিত জনপ্রিয় ও আনন্দোৎসব হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে দু-হাজার বছর আগে প্রভুযীশু খ্রীষ্ট অতি দীন-হীনভাবে গোশালার যাবপাত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্ট যেদিন জন্মেছিলেন সেদিনই ছিল মানুষের সাথে ঈশ্বরের মহামিলনের একটি দিন। সেই দিনটি চির জাগরুক করে তুলতে আমরা মহাসমারহে বড়দিন উদ্‌যাপন করে থাকি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে- যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমরা আমাদের আত্মিক শুভ্রতার চেয়ে বাহ্যিক চাকচিক্যকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি। বড়দিনে কে কি পোষাক পড়ব, কি কি পিঠা বানানো হবে, কিভাবে ঘর সাজানো হবে, কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করে ধুমধাম করা যাবে, তা নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পরি। আমরা যে প্রভুযীশু খ্রীষ্টের জন্ম উৎসব পালন করি, ভুলে যাই সেই খ্রীষ্টের বাণী। হিংসা, ক্রোধ, পরনিন্দা, পরচর্চায় মেতে উঠি। জাগতিক চরম ব্যস্ততার কারণে, বড়দিন বা ইস্টার ছাড়া নিয়মিতভাবে রোববারের মিসায় যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। সান্ধ্য প্রার্থনায়ও বসা হয়না। আমরা বার বার মন্দের দ্বারা পরাজিত হই। খ্রীষ্টকে গ্রহন করতে প্রকৃতভাবে অন্তরকে সাজাই না।

আজ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যখন বিরাজ করছে অশান্তি, যুদ্ধ-হানাহানি, কাটাকাটি আর ঠিক তার মাঝেই উপস্থিত বড়দিন। মুক্তিকামী ও শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ দিশেহারা। এ করুণ অবস্থায় মুক্তিদাতা প্রভুযীশু খ্রীষ্ট আসছেন আশার বাণী নিয়ে, প্রত্যাশার মন্ত্র নিয়ে। ঠিক এমনিভাবেই দু-হাজার বছর আগে, প্রভুযীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপ মোচনের জন্য এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, প্রতিশোধ নয় বরং ক্ষমাই শান্তির সোপান। ঘৃণা নয় প্রেমই শ্রেষ্ঠ। দীনহীনদের সেবার মাঝে ঈশ্বরকে সেবা করা যায়।

এ শুভদিনে আমরা আমাদের পাপময় জীবন পরিহার করে, পুণ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার শপথ নিতে পারি।

বড়দিনঃ সকলকে ভালবাসার ও ক্ষমা করার দিন

লিলা এল রোজারিও, উডসাইড, নিউইয়র্ক

ঝরা পাতার দিনগুলো মনে করিয়ে দেয় হেমন্তের কথা। হেমন্তের আগমনে প্রকৃতি এক ভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়। ধীরে ধীরে শীত নামে ধরণীতে। প্রাকৃতিক এই বিবর্তনের পালায় আসে শিউলী ঝরা সকাল, কুয়াশাচ্ছন্ন কিংবা শিশির ভেজা প্রভাত যা মূলতঃ কনকনে শীতের আগমনী ঘোষনা করে। শীতের এই পথ ধরেই আসে বড়দিন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন। বিশ্বের সকল খ্রীষ্টানগণ অত্যন্ত আনন্দ-উদ্দিপনার সাথে এ দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে।

প্রিয় পাঠক, আমি ছোট্ট একটি উপমা সংযোগে বড়দিনের তাৎপর্য আপনাদের সমীপে তুলে ধরতে চাই। পিতা ও পুত্রের মধ্যে যদি কোন বিবাদ কিংবা সংঘর্ষ ঘটে তাহলে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। সাময়িকভাবে উভয়ই সম্পর্কবিহীন অবস্থায় বসবাস করতে থাকে। উভয়ের মনে থাকে অশান্তি ও নিরানন্দভাব। উভয়েই খুঁজে বেড়ায় কিভাবে এ সমস্যার নিষ্পত্তি করা যায়। তাই না? একটু ভেবে দেখুন।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তক পাঠ করলে এমনি একটি ঘটনা আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে। ঈশ্বর এই পৃথিবী, আকাশ-বাতাস-তারকারাজি, অসীম জলরাশি, পশু-পক্ষী সবই সৃষ্টি করলেন তার মুখ নিঃসৃত বাক্যের মাধ্যমে। এ সবই সৃষ্টি করলেন মানুষের জন্য। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির বেলায় তিনি থেমে গেলেন। মুখ নিঃসৃত বাক্যের দ্বারা তিনি মানুষ সৃষ্টি করেননি। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনি বলেননি, মানুষ হোক। নিজের হাতে পুতুল বানিয়ে আপনার প্রাণবায়ু দ্বারা ফুঁ দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষকে দিলেন নিজ সন্তানের মর্য্যাদা। আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন। তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন স্বর্গ উদ্যানে। অতি নিরাপদ ও সুন্দরতম স্থান। যেখানে দুঃখ-দারিদ্য, হিংসাদ্বেষ ছিল না। চোর যেখানে সিঁদ কাটতে পারে না। এমনি আনন্দপূর্ণ স্থানে সৃষ্টির প্রথম মানুষ তথা আদম-হবা বেশীদিন অতিবাহিত করতে পারেনি। অচিরেই শয়তান দ্বারা প্রলোভিত হয়ে সৃষ্টির প্রথম নর-নারী পাপে পতিত হয়। কারন তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করেছিল। কিন্তু হায়! দুর্বল মানুষ উক্ত ফল খেয়ে ঈশ্বরের কাছে অবাধ্য হয়। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাদের উক্ত স্থান থেকে বহিষ্কার করলেন ও অভিশপ্ত করলেন তাদের উভয়ের জীবনকে। আদমকে বললেন, তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার আহার যোগাড় করবে। হেবাকে বললেন, তুমি অতি কষ্টে সন্তান জন্ম দিবে। আর সর্পকে বললেন, মানুষ তোমার মস্তক চূর্ণ করবে। এখানেই মানুষও ঈশ্বরের মধ্যে বাঁধে সংঘাত। পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করে। নামে ধস। পৃথিবী তখন শয়তানের রাজ্যে পরিণত হয়। চারিদিকে অবিশ্বাস ও অশান্তি বিরাজ করে। মানুষ ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়। ঈশ্বরের পুত্র নামে গণ্য হবার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ঈশ্বরকে ভুলে মানুষ নানা পুতুল-দেবীর পূজায় মেতে উঠে। বেশ্যাবৃত্তিতে সমাজ জীবন ভরে উঠে। পৃথিবীকে এমনি ভাবে পাপে নিমজ্জিত হতে দেখে ঈশ্বর মনে কষ্ট পেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন তার একজাত পুত্র খ্রীষ্টকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন যিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিবেন।

ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেথলেহেমের এক গোশালায় অতি দীনবেশে এক শীতের রাতে জন্ম নিলেন রাজাধিরাজ খ্রীষ্ট। তাঁর জন্মের সংবাদ প্রথম পেলো প্রান্তরে জাগ্রত ও পাহারত অশিক্ষিত ও ডানপিটে রাখালেরা। তারাই প্রথম নবজাত খ্রীষ্টকে প্রণাম জানায়। রাখালদের প্রণামের পর পূর্বদেশের তিন পন্ডিত তাঁকে প্রণাম করতে ছুটে আসে। পথে দুষ্ট রাজা হেরোদ তাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। তাদের কাছ থেকে খ্রীষ্টের জন্মস্থানের খোঁজ নিয়ে এই নবজাতকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে রাজা হেরোদ। কিন্তু এই তিন পন্ডিত খ্রীষ্টের চরণ প্রণাম করে ভিন্ন পথে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে রাজা হেরোদের পক্ষে খ্রীষ্টের জন্মের কোন সন্ধান লাভ সম্ভব হয়নি। খ্রীষ্টকে হত্যা করাও সম্ভব হয়নি। ইহা কোন নিছক গল্প নয়। এক সত্য ইতিহাস।

তাঁর আগমনে পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। পিতা পুত্র সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। মানুষ আবার ঈশ্বরের ধ্যানে ও বিশ্বাসে এবং ভক্তিতে মগ্ন হয়।

বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তি। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বর মানুষের জন্য বয়ে এনেছে শান্তি। আমরা শান্তি চাই। কিন্তু শান্তির কাছে যেতে চাইনা। আমরা শান্তির অন্বেষণ করি বটে, কিন্তু শান্তির উৎস থেকে সরে থাকি। ঈশ্বর নিজেই শান্তির উৎস, তিনিই শান্তিদাতা, স্বর্গদূতের ঘোষনায় এই কথাই প্রমাণিত হয়, "জয় ঊর্ধ্বলোক পরমেশ্বরের জয়। ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানুষের অন্তরে" (লুক ২.১০.১৩)। শান্তি হচ্ছে সুস্পর্ক যা ভালবাসায়, ক্ষমায় ও ত্যাগে হয় লালিত।

বড়দিন আত্ম জিজ্ঞাসার দিন। নিজেকে নম্র করার দিন। কারন খ্রীষ্ট অতি দীন বেশে এক গোয়াল ঘরে জন্ম নিয়ে নিজেকে নত করেছিলেন। আমাদের উচিত তাঁর এই দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে অনুসরণ করা।

আমাদের প্রবাসী জীবনেও বড়দিন আসবে। আমরা প্রতি ঘরে ঘরে কীর্তন করব, মধ্যরাতের খ্রীষ্টযাগে যোগদান করব, অতিথি আপ্যায়ন করব, নূতন কাপড়-চোপড় পরিধান করব, বাড়ী-ঘর সাজাবো, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করব - আসুন, এসব কিছুর মধ্যে আমরা খ্রীষ্টের প্রেম ও ক্ষমার বাণী পরস্পরের মধ্যে বিতরণ করি। বড়দিন তো পরস্পরকে ভালবাসা ও ক্ষমা করার দিন। ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের পাপকে ক্ষমা করে আমাদের ভালবেসেছেন। তিনি আমাদের ভালবেসেছেন বলেই, স্বর্গের সিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এলেন মর্তে। তাঁর এই মহান শিক্ষা অনুকরণের মাধ্যমে আমরা এই প্রবাসী সমাজকে করে তুলতে পারি আনন্দময় ও উপভোগ্য এক বাসস্থানে।

সম্মেলনের ভিডিও

নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত ১ম বাঙ্গালী খৃষ্টান সম্মেলনকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় নিপুন শৈল্পিক ছোঁয়ায় ভিডিও বন্দী করেছেন প্রবাসীর দক্ষ ফটোগ্রাফারগন। এই ঐতিহাসিক 'আনন্দমিলন'-এর ১ কপি (২টা ভিডিও) আজই অর্ডার করুন। কালের প্রবাহে এই আনন্দ মিলনই হবে আমাদের আনন্দ স্মৃতি।

মূল্য - ১ কপি (২টা ভিডিও) ২৫.০০ (পঁচিশ ডলার) মাত্র। চেক পাঠাতে হবে `PBCA' -এর নামে।

চেক পাঠানোর ঠিকানা ঃ

PBCA P.O. Box-1258, New York, NY 10159

Phone (917) 767-4632, (646) 773-7790

DOUBLE DUTY: Caroline Rozario, 7, smiles as she points out her favorite Christmas ornaments on the family Christmas tree. The Timber Drive Elementary student is geared up for a busy holiday, celebrating both a traditionally American and a Bangladeshi holiday. (Times photo by Jessica Bennett)

For immigrant families, holidays blend new traditions with old

By JESSICA BENNETT'
***Staff* Writer**

Caroline Rozario isn't all too concerned about Santa's arrival this Christmas. Not that Caroline wouldn't enjoy the visit, but the 7-year-old's Christmas schedule is so packed 'with parties, church and a return performance as an angel in the church nativity play, she might not even be home when Santa takes his turn in Garner.

She says she's excited about baking cookies and cakes with her mother, Shelly Rozario. She says she's excited about buying and giving Christmas presents away. And she says, with a quick smile, she's excited about dressing up Christmas Eve.

"It's going to be fun," Caroline says about Christmas. "I'm going to do the play, be an angel, and I'm going to dance."

Caroline is one or three children in the Rozario family. Born on American soil, the Timber Drive Elementary student is as all-American a youngster as you can find: bright-eyed and polite, energetic, hopeful, but her Christmas celebration is a fusion of two cultures,

American and Bangladeshi.

On Christmas Eve, the Rozarios will attend two church services, one at St. Mary's Catholic Church on Aversboro Road and a second later that evening at St. Raphael's Catholic Church in on Falls of the Neuse Road in Raleigh. At the second service, Caroline and family will join in celebration with roughly 50 other Bangladeshis, some long established in the United States and others beginning their journeys as Americans.

And Caroline, along with an uncanny energy, shows off his model Batman as he zooms through the house in constant search of company. A hill of presents sits underneath the Christmas tree, stockings adorn the fireplace mantel, and Christmas cookies are passed around with a Betty Crocker kind of ease.

Though all very commonplace for an American home at Christmas, hints of their Bangladeshi heritage are easily discovered. A scent of curry permeates the air, enough to make one ask what smells so good. A hanging next to their Christmas tree is scribed in Bengali. Photos show happy women clad in Chinese red or mustard yellow saris, foreheads painted.

Rozario's mother, a delicate woman wearing a pink sari, sits in the living room, as silent as Christmas night itself.

It is impossible to leave the Rozario home without taking something with you, be they calories or something else. Giving, Rozario says, is a cornerstone of her family.

"My children have learned to give," Rozario said. "Now, when we're in the store, my children will say, 'Mamma, buy this for this person."

When asking Caroline about giving, she says it's nice to make another person feel good.

"They feel happy they have a present," she said. "And I feel good about giving, when my mom buys stuff that {people] would like for Christmas."

But for now, Caroline has big plans leading up to Christmas. Out of school for the holidays, she's already dictated her goals before the holidays.

One important one: getting her room cleaned.

"I'm going to get ready for Christmas," she said. "We can start making cookies and cakes.

"And I'll have to clean up my room because people are going to cOme over and look at my room."

taken for granted.

Anti-Christian sentiment is prevalent in Bangladesh, and in most major Bangladeshi cities, curfews are imposed during Christmas to prevent violence and vandalism many Bangladeshi churches and members repeatedly endure. Christmas services are often canceled, and many Christian Bangladeshis flee from the cities to outlying villages.

Rozario, who spent parts of her childhood in Chittagong and Dhaka, Bangladesh's bustling capital located in the middle of one of the world's largest rice producing regions, remembers leaving her home Christmas for her grandmother's home outside the city.

There, celebrations ran into the wee hours of Christmas morning.

Though the cities became dangerous for Christians, Rozario said, the countryside remained calm. But the reli gious animosity her family experienced finally prompted her father to immigrate in 1984.

"Everyone that has children would try to move," Rozario said.

Dhaka today has more than 700 mosques.

Inside the Rozario home, Sunny Jr., an affable toddler

with her mother and other women in the group, will dress in traditional Indian dress, long, silky saris in bright colors, for the church service and socials afterward.

Keeping with Bangladeshi tradition, after church the group will go home to home, nibbling on sweets created from native Bangladeshi recipes. They will dance and mingle and even sing Christmascarols, as chatter in Bengali, a Dangiadeshi's mother tongue. fills the background.

"What's fun about Christmas is that we go to people's homes and the whole family is together and we have fun," Caroline said.

Neither Caroline nor her two brothers, Christopher and Sunny Jr., have ever visited their parents' native country, but keeping their ethnic culture alive is a priority for the Rozarios.

"I encourage my children to know," Shelly Rozario said. "If I don't keep that in their mind, they'll forget."

Christmas is no exception. For Christian Bangladeshis living in their Muslim-majority native country, a Christmas Eve centered around numerous celebrations and church is the norm. But it is a norm never

লেখা আহ্বান

পরবর্তী "তেপান্তরী"তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন।

PBCA
P.O. Box 1258, NewYork NY 10159
E-mail: Probashi051601@aol.com

আহ্বান

**"ফসল প্রচুর কিন্তু মজুর অল্প
অতএব, তোমরা ফসলের মালিককে
অনুরোধ করো, তিনি যেন শষ্য ক্ষেত্রে
মজুর পাঠিয়ে দেন।"**

শীলা রোজারিও, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক

'আহ্বান' শব্দের অর্থ হলো ডাক। ইহা যে কোন ধরনের ডাক হতে পারে। যেমন সন্ন্যাস জীবনের অথবা সাংসারিক জীবনের ডাক। এখানে আধ্যাত্মিক অর্থে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। আহ্বান মানে মাতা মন্ডলীর কাজে ব্রতধারী, ব্রতধারীনিদের অংশ গ্রহণ।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এই মার্কিন মুল্লুকে এসেছি পারিবারিক ও নিজ ভাগ্য উন্নয়নের প্রত্যাশায়। আজ প্রায় এক যুগ ধরে আমি এই প্রবাসের বাসিন্দা। এই প্রবাসী সমাজের প্রায় সকল কর্মকান্ডে আমি জড়িত। একটি মাত্র ইচ্ছায়, সমাজকে সুসংগঠিত করার জন্য। যা হোক, আজ এই প্রবাসী সমাজের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় কাজে আহ্বান নিয়ে কিছু বলা এই লেখার উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রবাসী খ্রীষ্টান সমাজ এখন আর ক্ষুদ্র নেই। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও কানেকটিকাট এই তিনটি রাজ্যের সমন্বয়ে আমাদের এই প্রবাসী খ্রীষ্টান সমাজ। প্রায় চারশত পরিবারের বসবাস। উপরে উল্লেখিত ৩টি স্টেটে মাত্র একজন বাঙালি পুরোহিত। তিনি আমাদের ফাদার স্টেনলী গমেজ যিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের মহান আশীর্বাদ। কিন্তু তিনি নিউজার্সি স্টেটের পুরোহিত। বর্তমানে তিনি এক গুরু দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমাদের বাড়ি আশীর্বাদ, বাপ্তিস্ম, বিবাহ ও মৃতের সৎকারে তিনি সর্বদাই আমাদের পাশে উপস্থিত। তিনি যখন কোন সুযোগ পান তখনই বাচ্চাদের উদ্দেশ্য করে নানা গল্পের মাধ্যমে আমাদের সমাজে ফাদারের কি প্রয়োজন তা বলেন। এই প্রবাসে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে বাস করছি। এই সমাজে ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কিংবা কোন প্রভাব বিস্তার অন্যায় কাজ বলে বিবেচিত। এই সমাজ সবদিক থেকে উন্মুক্ত, তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা কখনো কখনো বিপথে চলে যায়। তাদের কে দিবে সঠিক কিংবা আধ্যাত্মিক পথের দিশা? একজন সাধারণ খ্রীষ্ট ভক্তের চেয়ে একজন পুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টারের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য। কিন্ত আমাদের ব্রতধারী, ব্রতধারীনির একান্ত অভাব। বাংলায় পাপস্বীকার করা অন্যতম সমস্যা। ইংরেজী মিশায় যোগদানে আমরা স্বাচ্ছন্দবোধ করিনা। রবিবারের উপদেশ বুঝতে অনেকে অক্ষম। এসব সমস্যা সমাধানকল্পে আমাদের তথা সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কিভাবে? আমি এ বিষয়ে কোন সাড়া দেখিনা। প্রবাসী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন বছরে একবার আহ্বান দিবস উদযাপন করে পরিবার ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে আহ্বান বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পিতা মাতারা তাদের ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করতে পারেন। যেমন সন্তানদের নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় মালা প্রার্থনা করে, রবিবার দিন একত্রে খ্রীষ্ট যাগে যোগদান ও পবিত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ, নানা সাধু সাধ্বীদের জীবনী পাঠ করে তাদের শোনানো। ফাদার, ব্রাদার সিস্টার হলে সমাজ ও খ্রীষ্ট মন্ডলী কিভাবে উপকৃত হবে সে সব বিষয়ে তাদের বুঝিয়ে অণুপ্রানিত করুন। পিতা-মাতাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি পরিবার এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর ন্যায়। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সর্বোত্তম।

ছোটবেলায় দেখেছি সেমিনারিতে বা গঠন গৃহে প্রবেশের জন্য বৎসরের শুরুতে ধর্মপল্লীগুলিতে বেশ সাড়া পড়ে যেতো। কোন কোন পরিবার থেকে একাধিক ছেলেমেয়ে এগিয়ে এসেছে। মা, বাবা, দাদা, দাদী ছেলেমেয়েদের ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের অনেক উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। সকাল হতে না হতেই মা ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে বলেছেন বাবা তাড়াতাড়ি উঠো, তোমাকে আজ সেবক হতে হবে। আজকাল সে দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। সময়ের আবর্তে পরিবেশে পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারগুলোতে উৎসাহের ভাটা পড়েছে। ছেলেমেয়েদের মাঝেও একই অবস্থা। আজ যদি একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করি তুমি বড় হয়ে কি হবে? শিশুটি উত্তর দেয়, আমি একজন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবো। বলুন তো - শিশুটি কেন এমনি উত্তর দিয়েছে? আগেই বলেছি, পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে। তাই না? তাই এই সমস্ত কিছুর জন্য আমরাই দায়ী। আমরা সবাই সোনার হরিণ ধরার জন্য ছুটেছি। যে পরিবারে নিয়মিত মালা প্রার্থনা করা হয়, প্রতি রবিবারে খ্রীষ্টযাগে যোগদান ও পবিত্র কমূনিয়ন গ্রহণ করা হয় সে পরিবার ঈশ্বরের গৃহে পরিণত হয়। সেই পরিবার থেকে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আহ্বান আসতে বাধ্য। তাই আসুন, আমরা প্রার্থনাশীল জীবন যাপন, পারিবারিক উৎসাহ প্রদান করে আমাদের সন্তানদের প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কাজ করার অনুপ্রাণিত করি। দিনে দিনে মন্ডলীর সদস্য/সদস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য মজুরের অভাব। এই অভাবের কথা চিন্তা করে, আসুন প্রার্থনা করি প্রভু যেন তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর পাঠিয়ে দেন। যে মজুরের আগমনে আমাদের প্রবাসী খ্রীষ্টিয় সমাজ আত্মীক পূর্ণতা লাভ করবে ও আদর্শ খ্রীষ্টিয়-জীবন যাপন করতে পারবে।

বড়দিনের প্রস্তুতি

নমিতা কস্তা, উডসাইড, নিউইয়র্ক

আমেরিকায় আসার পর থেকে একে একে ১২টা বড়দিন পার হয়ে গেলো। কিন্তু লিখি লিখি করে সময়ের অভাবে আর লেখা হয়নি। এবার আর না লিখে পারছিনা। শুনুন তা হলে আমার অভিজ্ঞতায় আমেরিকায় বড় দিনগুলোর কিছু কথা। আমরা গ্রাম বাংলার সন্তান জাতিতে বাঙালী । বাংলাদেশের বড় দিনের মধু মাখা সেই সব স্মৃতি নিশ্চয় আজও সকলের হৃদয় জুড়ে গেঁথে আছে। আমার কিন্তু আজও প্রতি বৎসর এমনি সময় বেশি করে মনে পড়ে দেশের বড়দিনের কথা। বড় দিনের দু'এক মাস আগে থেকে মনের দোলায় সেই পিঠা পায়েসের গন্ধ। ঢেঁকিতে চিড়া কুটার শব্দ। মা, দিদিমার মুড়ি ভাজার মুড় মুড়, হ্যাজাক লাইটের ঝলসে দেয়া আলো, আর কীর্তন, কানের সুমধুর সুরের মহনা আজও মনে দোলা দেয়। দেশ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির বিধান। এদেশ আমায় বেঁধে রেখেছে সে সব থেকে। মনের বাগানে দুঃখের নিশি বোধ হয় ভোর হবার নয়। ভাগ্যের টানেই বলেন, আর কপালের দোষেই বলেন। এসেছিলাম সোনার হরিণের খোঁজে এই আমেরিকায়। সোনার হরিণ পাইনি তবে ডলারের গন্ধ পেয়েছি অনেক। এইতো বুঝি সুখ। ১২টা বড় দিন পার হয়ে এবার আরেকটা নতুন বড়দিনের দিন গুণছি। বড়দিন প্রায় আমাদের দোরগোড়ায় এসে পরেছে। এবার তাহলে নতুনভাবে বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করি। বড় সাঁঝ সাঁঝ রব চারিদিকে। মেতে উঠেছে ধরনী, সপিং সেন্টারগুলো এমনিভাবে সাজিয়েছে, সন্ধ্যায় বাইরে তাকলে মনে হয় হাজার ক'টি জোনাকী তার আলোয় ভরে দিয়েছে বিশ্বটাকে। রাস্তাঘাট, চারিদিকে রঙ্গিন বাতির ঝলকানি। বাড়ি ঘরগুলো দেখলে মনে হয় ছোট ছোট গোশালা। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে নর্থ পোল থেকে আগত সান্তাদাদু বাচ্চাদের আজব গল্পের কাহিনী বহন করে ব্যাগ ভর্তি গিফট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব দেশের দিক নির্ণয় মহাজ্যোতি তারাটি আজ সবার আঙ্গিনায়। ছোট বন্ধু শিশু যীশু শোয়ানো থাকে যাবপাত্রে, মা মেরী দেখছে দু'নয়ন ভরে তার একমাত্র সদ্যজাত পুত্রকে। বাবা জোসেফ পাহারারত। কোমলমতি মেষগুলো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যাবপাত্রের পাশে। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ, হাঁড় কাঁপানো শীতে আমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন ঠিক আমেরিকার শ্রাবণ সন্ধ্যা দেখতে ঠিক যেমন। মানুষ কিনা করতে পারে? আমার শুধু মনে হয় স্বর্গটাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে পারেনি। কিন্তু আর্টিফিসিয়াল সব কিছু তৈরি করে এ দেশটাকে বড়দিনের নামে নকল স্বর্গপুরী তৈরি করেছে। দেখতে ভালই লাগে। কিছু দিনের জন্য হলেও বা অল্প সময়ের জন্য হলেও মনে এক নতুন দোলা লাগে। শীতের শুরু থ্যাংক্সগিভিংস থেকে কনকনে ঠান্ডা পড়তে থাকে। তার কিছুদিন পর থেকে বরফ পড়তে শুরু করে। কখনো একটানা, কখনো থেকে থেকে, চারিদিকে তাকালে মনে হয় সাদা তুলার পাহাড়। আমরা যারা এদেশে থাকি তারাই শুধু অনুভব করতে পারি ও চোখে দেখি। ঠান্ডায় গাছ পালাগুলো শুকিয়ে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। বড়দিনের আমেজ চারিদিকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তার অনুভূতি প্রকাশ করছে। একে অন্যের সাথে ভালোবাসার উপহার বদল করছে। কেউ কেউ নানাভাবে সাজ গোজ করে অন্যদের আনন্দ দিচ্ছে। কেউবা কেনা কাটায় ব্যস্ত। রাস্তাঘাটে কেউ কেউ বড় বড় গাড়িগুলোকে সাজিয়ে সান্তাদাদু হয়ে গিফট দিচ্ছে। কেউ বা স্বর্গদূত সেজে তুরি বাজিয়ে সুসমাচারের গানগুলো মধুর সুরে গেয়ে চলছে। বড়দিনের সবটুকু আনন্দ ঈশ্বর এদেশের অনুভূতিতে দিয়েছেন। আপনারা যে যেখানে থাকেন একবার এসে দেখলে বুঝবেন আমার লেখা বাস্তবে কতটা সত্যি। বড়দিনের আনন্দ প্রভু যীশুর জন্ম সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ ও শান্তি।

লেখা আহ্বান

পরবর্তী "তেপান্তরী"তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন।

PBCA
P.O. Box 1258, NewYork NY 10159
E-mail: Probashi051601@aol.com

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মটোরোলা

ডমিনিক ব্লেইজ পিউরিফিকেশন, ফ্লোরিডা

বর্তমানের এই ব্যস্ততম পৃথিবীতে পরিবার, আপনজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ রাখবার একটি প্রধান মাধ্যম সেলুলার/মোবাইল ফোন ও পেইজার। আর এই সেলুলার ফোন বা পেইজার এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে কোম্পানী উদ্ভাবণ করেছিল সেই কোম্পানীর নাম "মটোরোলা"। যদিও গত দশ-বৎসর ধরে এই সেলুলার ফোনের ব্যাপক বৃদ্ধি লাভ হয়েছে। কিন্তু মটোরোলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৭৫ বৎসর পূর্বে।

বর্তমান জগতে আধুনিক বহু ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যে মটোরোলার অনেক অবদান আছে যা সবার নজরে পড়ে না। কম্পিউটার, যানবাহন, মহাশূন্যযান থেকে শুরু করে ঘরে ব্যবহৃত কেবল টেলিভিশন বাক্স, ইন্টারনেট মোডেম সবকিছুর মধ্যে মটোরোলার তৈরি 'চিপ্স' আছে। যাকে ঐসব দ্রব্যের মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। এইসব চিপ্সের মধ্যে অনেক সময় শুধু ইংরেজী শব্দ 'এম' ছাপা থাকে। যা দেখতে অনেকটা 'উইক্স' এর মত।

এই মটোরোলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৯২৮ সালে গ্যালভিন ম্যানুফ্যাকচারিং করপোরেশন নামে এবং পল ভি গ্যালভিন ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। এর প্রথম পণ্য ছিলো "ব্যাটারী এলিমিনেটর" যার সাহায্যে মানুষ ব্যাটারী ব্যাতি রেখে ঘরের বিদ্যুৎ ব্যবহার করেই রেডিও চালাতে সক্ষম হয়। ১৯৩০ সালে বানিজ্যিক ভাবে উৎপাদন করা হয় গাড়ীর জন্যে রেডিও "MOTOROLA" নাম দিয়ে, যা Motor Car এবং Radio এই দুই শব্দের সমন্বয়ে "গতির মধ্যে শব্দ" বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। এই সময়ে এই কোম্পানী ঘরের জন্যে রেডিও, পুলিশ বিভাগের জন্যে রেডিও, জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম এবং জাতীয় পর্যায়ে পণ্যের বিজ্ঞাপণ চালু করে। ১৯৪৭ সালে এই সুবাদে গ্যালভিন ম্যানুফ্যাকচারিং করপোরেশনের নাম পরিবর্তন করে MOTORALA, INC. রাখা হয়।

চল্লিশের দশকে সরকারী কর্মকান্ডে মটোরোলা যুক্ত এবং অ্যারিজোনার ফিনিক্স শহরে Solid-state electronics এর উপর একটি গবেষণাগার স্থাপন করে। পল গ্যালভিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি সামরিক ক্ষেত্রে, মহাকাশ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কৃতিত্বের ছাপ রাখে। এই সময়ই মটোরোলার প্রথম সেমি-কন্ডাক্টর এবং জনগণের বিনোদনের জন্যে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক পণ্য বাজারজাত করে। ১৯৫৯ সালে এই মহান উদ্যোক্তা পল গ্যালভিনের মৃত্যু হয়।

১৯৬০ সালে পল গ্যালভিনের সুযোগ্য উত্তরসুরী রর্বাট ডাব্লিউ গ্যালভিনের নেতৃত্বে MOTORALA আন্তর্জাতিক ভোগ্যপণ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বানিজ্যিক, শিল্প কারখানার ও সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহৃত পণ্যের উপর মনোনিবেশন করে। ১৯৭০ এর মাঝামাঝি MOTORALA তার রঙিন টেলিভিশন উৎপাদনের কারখানাটিও বিক্রি করে। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে এই কোম্পানী সারা পৃথিবী ব্যাপী সেলুলার ফোনের সরবরাহকারী হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৬ সালে বহুল প্রশংসিত তিন আউন্স ওজনের পকেট সাইজের STARTAC. সেলুলার ফোন উৎপাদন শুরু করে মটোরোলা।

GENERAL INSTRUMENT CORPORATION ক্রয় করার পর মটোরোলা কেবল মোডেম এর SET-TOP-TERMINAL তৈরীতেও একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে MOTOROLA তারহীন, ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, কর্মস্থানে দলীয় কর্মকান্ডে, যানবাহনে এবং বাসস্থানে এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগের সুবিধা নিশ্চিত করছে।

MOTOROLA আমাদের দিয়েছে বহুধরনের গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য আমাদের নিজ প্রয়োজনের সুবিধার্থে। PAGE WRITER নামে বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ টেক্স সহ দ্বিমুখী (TWO-WAY) পেজার এই কোম্পানীরই তৈরী। এই পেজারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী অন্যান্য পেইজের প্রতি উত্তর করা ছাড়াও ই-মেইল এবং ফ্যাক্স মেসিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। মটোরোলার মাইডেন ফোন একই সাথে দ্বিমুখী রেডিও যোগাযোগ করতে পারে। NEXTEL, AT2T, T-MOBILE, CINGULAR, VARIZON এই সব কোম্পানীই তাদের কাস্টমারদের জন্যে মটোরোলার তৈরী ফোন দিয়ে থাকে। মটোরোলার স্টারটেক ফোনের পর V60i এবং T722i বহু নাম করেছে। বর্তমানে মটোরোলার ফোন রঙিন ছবিও তুলতে পারে এবং ভিডিও গেইম খেলতে পারে।

১৯৯৭ সালে MOTOROLAর গোড়াপত্তনকারী পল গ্যালভিনের গোত্র খৃষ্টফার গ্যালভিন চিফ ওপারেটিং অফিসার নির্বাচিত হয়ে এর প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২০০০ সালে MOTOROLA র নেট পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় সাঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার। যা ছিল কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আই.বি.এম এর চেয়েও বেশী। এই সময় সারা বিশ্বে MOTOROLA সর্বমোট কর্মচারীর সংখ্যা ছিল একশত সাতচল্লিশ হাজার, এদের মধ্যে অনেকেই বড়বড় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক।

বর্তমানে MOTOROLA সারা বিশ্বের কারিগরী ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ পণ্য উৎপাদনের এক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত। আমেরিকা ছাড়াও মটোরোলার স্ফটওয়ার ডেভালোপ সেন্টার এবং পণ্যের প্রস্তুতকারী কারখানা রাশিয়া, চায়না, ইন্ডিয়া, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, বৃটেন, কানাডা সহ বহুদেশে অবস্থিত। সারা বিশ্বের করপোরেট হেড কোয়ার্টার শিকাগোর কাছে সামবার্গ শহরে অবস্থিত। আমেরিকাতে মটোরোলার ইলিনর স্টেটের বিভিন্ন শহর ছাড়াও ফ্লোরিডা, অ্যারিজোনা, নিউজার্সি, কানেকটিকাট প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

ত্রুটিমুক্ত সফটওয়্যারের জন্যে মটোরোলার বিভিন্ন সেক্টর SEI - লেবেলের সর্ববৃহৎ স্বীকৃতি Level - 5 এবং পণ্যের জন্যে National Quality Award পেয়েছে।

আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, সি.আই.এ, এফ.বি.আই, মিলিটারী, ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রায় সব গোয়েন্দা বিভাগই মটোরোলার তৈরী সবচেয়ে উন্নতমানের সিকিউর ইনক্রিপটেড টু-ওয়ে পোর্টেবেল ও মোবাইল রেডিও ব্যবহার করে থাকে। এই রেডিওর মাধ্যমে ডিজিটাল ফোন, ম্যাসেজ, আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ, ক্রিমিনালের ছবি ইত্যাদি গ্রহণ ও নিজ নিজ হেডকোয়ার্টারে প্রেরণ করা যেতে পারে তারবিহীণ যোগাযোগের মাধ্যমে।

২০০২ সালে মটোরোলা সপ্তম বারের ন্যায় EMMY AWARD লাভ করে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য তৈরীর জন্যে। মটোরোলার "MOTO" হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাপনে আয়েস আনা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

২০০৩ সালে মটোরোলার বর্তমান প্রধান এবং আমেরিকার ইতিহাসের ডাইনেষ্টি খৃষ গ্যালভিন অবসর গ্রহণের কথা ঘোষনা করেছেন।

সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেওয়ার গত দু'বৎসর মটোরোলা সহ অনেক হাই-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর অনেক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু তবুও মটোরোলা নিষ্ঠার সাথে জনকল্যাণে সব সময় এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও আসবে।

Perspectives on Education in Bangladesh

William M. Balsamo
(Kenmei Women's Jr. College, Himeji, Japan)

With a literacy rate of 42%, Bangladesh is a developing nation which realizes the need for education to serve as a foundation for economic growth. During the summer of 1998, which brought devastating floods, I was able to travel to the country, visit some schools and meet students and educators eager to learn, share and lead their country into the next century.

In the city of Dhaka, I first visited St. Gregory's High School. Although Bangladesh is a predominantly Muslim culture, many respected educational institutions are Christian mission schools which date back to the time of colonialism. Because of their excellence, they have been permitted to continue and today produce many of the leaders and intellects of the country. As in Japan, students at mission schools in Bangladesh come to get an education and not for religious conversion or religious instruction. Most students are Muslim or Hindu but enroll to take advantage of the benefits of a private education. They come mostly from middle and lower-middle class families and enter professions which service the public sector.

St. Gregory's is a small school with motivated students and a dedicated staff. Yet, unlike schools in the West, which are filled with technological equipment and teaching aids, St. Gregory's reflects the poverty of the country. The classrooms are small and crowded, with few resources for classroom teaching. Language classes lack tape recorders, cassette tapes and TVs. There are no language or chemistry labs. The classroom walls are undecorated and lack posters, maps and charts. The method of instruction is the traditional lecture by the instructor and note taking by students. The school's office doesn't have an adequate copy machine and the teachers lament that they have no access to computers or to e-mail.

Yet, there is a live and active spirit within the school itself. I was allowed to meet with one of the upper English classes and was impressed with their attention, discipline and the respect they demonstrated to their teachers. What impressed me most of all were the questions they asked me, which were intelligent, alert and informed. These were students about 17 years old who were taught by traditional language methods. They always raised their hands and stood by their desks when asked a question. They were not at all shy and were curious, especially about politics and culture. There was no need for the teacher to serve as a translator.

In the evening, I visited Notre Dame College, perhaps the most respected private college in Dhaka. Most students commute to school but at Mathis Hall, there's a dormitory for students who come from outside Dhaka. These students support themselves and supplement their tuition by working at the college and helping to maintain the premises. Although no scholarships are given, the students maintain the upkeep of the buildings and take care of the grounds in exchange for room and board. There is also a night school for students who work by day and a special program for students living in the slum quarters of the city who come to learn skills such as small scale farming and gardening.

At the time of the floods, the campus was converted into a refugee camp for those who had lost their homes in the crisis. There were over 200 families situated on the grounds of the college and the students of Mathis Hall helped administer to these people with food and medicine. This conversion of a college into a refugee camp served as a good example of how an educational institution could be converted into a haven for humanitarian causes. For the students, the lesson extended beyond the classroom; for education to lead to growth, it must be willing to embrace the needs of the larger community.

Several days later I visited St. Placid's High School and St. Scholastica's Convent in Chitta-gong, a city 200 kilometers east of Dhaka. St. Placid's, though a high school, runs a program for disadvantaged village children who learn how to sew, make simple clothes and train to be tailors. The children are young, but have a sense of pride and willingness to learn. St. Scholastica has a school, orphanage and nursery, all geared to serving the community.

In spite of the lack of funds and equipment, both teachers and students at these schools pursue learning with intent and interest. I met several housewives, teachers and students who taught private classes - math, Bangla, English - in their homes after school. They rely on their own self-made materials as there are few published supplemental textbooks or tapes.

Bangladesh television is far behind in providing quality educational programs for their people. There is nothing that even approaches the extent of educational television in the West. Occasionally there will be a program which deals with a health problem or social condition but these are quite limited. This is further complicated by the reality that not every family has access to a TV and TVs are not available in most schools.

One complaint by parents involves school teachers who withhold instruction from students in the classroom so that students will take private classes from them in their homes. This supplements their income and stems from the low salaries earned by public school teachers.

It's difficult to assess an entire school system based on observations of a half-dozen schools, but teachers and parents recognize the importance of a solid education based on math reading and sciences for their country's future.

Schools and teachers are in need of teaching aids in any form, especially maps, charts, used textbooks and other tools which we take for granted. The schools in this article may be contacted at the following addresses:

St. Gregory's High School, 82 Municipal Office Street, Luxmi Bazar, Dhaka,
Bangladesh 1100

Notre Dame College, Box No. *5,* Dhaka, Bangladesh 1000

St. Placid's High School, Pathegata, Box 152, Chittagong, Bangladesh 4000

St. Scholastica Convent, Pathegata, Chittagong, Bangladesh 4000.

লেখা আহ্বান

পরবর্তী "তেপান্তরী"তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন।

PBCA
P.O. Box 1258, NewYork NY 10159
E-mail: Probashi051601@aol.com

দাম্পত্য কলহ: শতাব্দীর লালিত ও লুকায়িত এক সামাজিক সমস্যা

সুবীর এল রোজারিও, উডসাইড, নিউইয়র্ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "শাসন করে যেই, সোহাগ করে সেই।" সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-বিবাদ কোন নূতন বিষয় নয়। ইহা অহরহ ঘটছে। কারণে-অকারণে। আজ এ বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। এই ভাবনা থেকেই লিখার প্রয়াস।

আমরা যদি এই সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাব ইহা নিঃসন্দেহে একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা। US. Department of Justice এর হিসেব অনুসারে ১৯৮৩ সালে আমেরিকায় ৭৫% স্বামী তাদের প্রিয়তমা স্ত্রীকে প্রহার করেছে। অন্য একটি জরিপে প্রকাশিত, প্রতি বছর আমেরিকায় দু'মিলিয়নের উপর স্ত্রী তাদের স্বামী কর্তৃক প্রহারিত হয়ে থাকে। আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সভ্যতায় সংস্কৃতিতে, আইন-কানুনের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি। এই জাতির অভ্যন্তরে যদি এমন সমস্যা বিরাজ করে তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের অবস্থা কি হতে পারে? পাঠক একটু ভেবে দেখুন। কারন তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি তো নুন আনতে পান্তা ফুরায়। আর সমস্যার বীজ এখানেই রোপিত। অর্থাভাব, চাকুরীবিহীন অবস্থা, আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ইত্যাদি মূলতঃ দাম্পত্য কলহের কারন।

মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Hariet Douglas একজন বিশিষ্ট সমাজ চিন্তাবিদ। তিনি বলেছেন, দাম্পত্য কলহ একটি লুকায়িত সামাজিক সমস্যা। স্বামী-স্ত্রী তাদের ঝগড়া-বিবাদের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করতে চায়না। তারা পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সর্বদাই গোপন রাখতে চায়। কারন ইহা লজ্জার বিষয়। তাছাড়া, প্রহারিত স্ত্রী তাৎক্ষনিকভাবে দৌড়িয়ে কোন আশ্রয়াস্থলে যায়না - কিংবা পুলিশ ডাকে না। স্ত্রী ভীত থাকে। যদি স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে। অন্যদিকে, সন্তানদের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা। এই লুকিয়ে রাখার কারনে সমস্যাটির ব্যাপকতা সমাজের কাছে তেমন ব্যক্ত বা প্রকাশিত নয়।

লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার কারনে সমস্যাটি যুগ যুগ ধরে কিংবা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে এসেছে - সমাজ যেন তাকে লালন করে আসছে। পাষন্ড স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বছরের পর বছর ধরে ভৎসনা কিংবা প্রহার করে তখন তার নিজের সন্তানেরা উহা দেখে ও শিখে। তারা যখন একদিন বড় হয়ে উঠে, তখন তারাও তাদের পিতাকে অনুসরণ করে। ফলে সমস্যাটির পুনরাবৃত্তি ঘটছে- তাই ইহাকে বলা হয় সমস্যাচক্র বা Cycle of repetitive episodes of abuse.

তবে হঠাৎ করেই স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বেঁধে যায় না। বিয়ের প্রথম দিনগুলো তো খুবই মধুময়। দু'জনে দু'জনায়। শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু বাস্তবতা খুবই নির্মম। ধীরে ধীরে নানা সমস্যার আবর্তে পড়ে তাদের সেই আনন্দপূর্ণ জীবন থুবড়ে পড়ে। প্রেমপূর্ণ সম্পর্কে চির ধরতে থাকে- যা চিরন্তন ও অনিবার্য। তাদের কলহের পর্যায়কে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ঃ এ সময়ে তারা নব দম্পত্তি। আদর-যত্নের অভাব নেই উভয় দিক হতে। পরস্পরের ভালবাসা যেন উপচিয়ে পড়ে। আঃ! ওগো নয়নমণি! তোমাকে সর্বদা চাই মোর নয়ন সম্মুখে। রোমান্সের এই সন্ধিক্ষণে কখনো-সখনো হালকা-পাতলা ধরনের কথা কাটাকাটি- অতঃপর চলে মান-অভিমানের পালা। মুখ তার ভারে পরিপূর্ণ। কথাটি বের হতে চায় না। এ পর্যায়ে যদি আরও কোন অঘটন ঘটে তা হবে অতিরিক্ত একটা চড় বা থাপ্পড়।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ লেবু চিপতে চিপতে স্বাদের লেবু হয়ে যায় তিতা। এ সময়ে তারা উভয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা ইস্যু খুঁজে বেড়ায়। এসব ইস্যু নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার সময় বেঁধে যায় তুমুল লংকাকান্ড। দেখা যায় স্ত্রী কোন ক্ষেত্রে একটু বেশী বাকপটু, যাকে আমরা বলে থাকি এতবড় মুখ! যা কখনো দেখিনি! ভাবিনি। কিন্তু স্ত্রীও ছাড় দিতে চায় না স্বামীকে। দশটা কথা সে শুনিয়ে ছাড়বে। আবার কি। অন্যদিকে স্বামীর আছে প্রচন্ড পেশীর শক্তি। এভাবে নেতিবাচক বিষয়ে যতই বাক-বিতন্ডা চলতে থাকে উভয়ের সম্পর্কের ইতিবাচক ক্ষেত্রে ততই ভাটা পড়তে শুরু করে। এক সময়ে ক্রুদ্ধ স্বামী সজোরে আঘাত ও নির্দয় ব্যবহার শুরু করতে থাকে। এভাবেই নেমে আসে দাম্পত্য জীবনে কোলাহলের ঘন কালো মেঘ যা সারা জীবনকে বেষ্টিত করে চলে; কখনো বিরামহীন গতিতে কখনো দীর্ঘ বিরতির পরপর। এক গবেষনায় দেখা গিয়েছে, যে সব দম্পত্তি বেশী কলহে লিপ্ত হয় তাদের জন্ম ও লালন পালন কলহপূর্ণ পরিবারেই হয়েছে।

সমাধানঃ এ সমস্যার সমাধান খুবই কঠিন। কারন পরস্পর চায় সমস্যাকে ঢেকে রাখতে। তাছাড়া ঝগড়া বিবাদ দাম্পত্য জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা গৃহের অভ্যন্তরেই ঘটে, লোক চক্ষুর সম্মুখে নয়। ইহা যেন দু'টি খালি কলসীর পাশাপাশি অবস্থানের ন্যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যে দিন কিংবা যে সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রীতে প্রচন্ড ঝগড়া হয়েছে- সে রাতে তাদের মধ্যে হয়েছে এক অনুপম যৌন মিলন। তারা যেন আবার প্রবেশ করেছে প্রেমের রাজ্যে। সখী তুমি কার? ভুলে গেছে সবকিছু। আবার সমস্যার আবর্তে পড়ে পুনরাবৃত্তি ঘটে নূতন কলহের।

প্রিয় পাঠক, এ পৃথিবীতে যা ধ্রুব সত্য তা হলো স্বামী একমাত্র স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী একমাত্র স্বামীরই জন্য। দু'জনে দু'জনার। একজন অন্যজন হতে পৃথক হবার নয়। পবিত্র বাইবেল বলে, "তারা আপন আপন পিতামাতা ত্যাগ করে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইবে। তারা হইবে এক মন, এক প্রাণ।"

ঝগড়ার পর আবার মিলন। মিলনের পর পুনরায় ঝগড়া। ঠিক যেন নদীর তীরের তরঙ্গমালার ন্যায়। নদী বক্ষে সৃষ্ট উত্তাল তরঙ্গমালা তীরের আঘাতে ভেংগে খান খান হয়ে যাচ্ছে - আবার সৃষ্টি হচ্ছে নূতন তরঙ্গমালার। দাম্পত্য জীবন আবেগ-ভালবাসায় তাড়িত ও আবর্তিত। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম তো আছেই।

সম্মেলনের ভিডিও

নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত ১ম বাঙ্গালী খৃষ্টান সম্মেলনকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় নিপুণ শৈল্পিক ছোঁয়ায় ভিডিও বন্দী করেছেন প্রবাসীর দক্ষ ফটোগ্রাফারগন। এই ঐতিহাসিক 'আনন্দমিলন'-এর ১ কপি (২টা ভিডিও) আজই অর্ডার করুন। কালের প্রবাহে এই আনন্দ মিলনই হবে আমাদের আনন্দ স্মৃতি।

মূল্য - ১ কপি (২টা ভিডিও) ২৫.০০ (পঁচিশ ডলার) মাত্র। চেক পাঠাতে হবে `PBCA' -এর নামে।

চেক পাঠানোর ঠিকানা ঃ

PBCA P.O. Box-1258, New York, NY 10159

Phone (917) 767-4632, (646) 773-7790

Family, Faith and Community in Our Lives

Blin Gonsalves, Elmhurst, New York

Our life is not a bed of roses. It is rather unpredictable and never flows in the same pace at all times. It is full of challenges and uncertainties. There are ups and downs in our lives. One should be prudent enough to take advantage of the opportunities of life so that he/she can be well prepared to face life when it takes a down turn. It is important that we have the skill and ability to turn the negative situation in life in to a positive one. Success in our life depends on how well we utilize the opportunities that come in our lives and also how well we make the right choices. Our education, family and social values, faith family bond & community support combined together help us meet the challenges and uncertainties of life. Our new generation in America has the rare opportunity to choose the best from both America and Bengali cultures. That is why I am sharing my own life experience to give our new generation the idea as to where we come from and with a hope that they probably will benefit from my experience. As the proverb says "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow".

Childhood

I was born in a middle class Christian family in a small village called Sonapur. It is in the district of Noakhali in Bangladesh. I was blessed with a hardworking father who put his family first and a mother who was devoted in giving us much love and care. When my mother held her arms around me, I would be overwhelmed by her love and responsibility she had for me and my other brothers. I was also blessed with good neighbors, community, attentive teachers, caring missionaries, and good schools. My father used to work for the Bangladesh Railway (then East Pakistan). My mother was a simple housewife. My parents were devoted Catholics. They made every effort to be a good Christian and to follow God's will in their every day lives. They were very much focused in their effort to install Catholic faith in us and teach us how to appreciate God's love in our lives. We always got together as a family in the evening to say our Rosary Prayer. In those days we did not enjoy the luxury and comfort of this modern age. But we had ample parental love and support from the caring community. We also had fun and enjoyment that were appropriate and available in those days. In my childhood there was a Catholic School in Noakhali. Despite the financial hardship, our parents sent us to the boarding school called (Saint Alfred's High School) in Padrishipbur in Barisal District for education. There were strict rules and discipline in the boarding school. This is where I learnt discipline, received quality education and this is where our catholic faith and belief were reinforced.

Professional and Marriage Life

I finished my High School at age 20. I got my first job at age 22. Once I got my first job, like any other elder son at my time in the Bangladesh society, I took up responsibility to look after my parents and my younger brothers. I always felt good to be able to take care of my parents and my younger brothers. Given our then so called Bangladesh social system, as the elder son, taking care of parents and siblings was not merely a moral responsibility but it was a "Must Do" responsibility. I am sharing this because this kind of feelings, sense of responsibility, family bond and commitment makes a positive impact in our families and communities.

I got married at age 27. My wife Violet and I are blessed with two sons and one daughter. Each of our childres's birth transformed our lives, bringing us the greatest gift of joy and happiness any parent could hope for. Their arrival made our family bond deeper and stronger. My wife Violet Gonsalves also worked hard hand in hand with me to properly raise our children, educate them, encourage their talents, provide them financial security and help them develop their spiritual lives. Similarly, the way our own parents brought us up.

Arrival in America

I used to work for the American Embassy. As such, I got an oppurtunity to come to America. I availed the oppurtunity and came to America in 1975. One year after my arrival in 1976 I was employed by Con Edison in New York. At that time, Bangladeshi people were not much aware of the oppurtunities in America. There was wide belief that America is only the land for highly professionals, like doctors, engineers, scientists, etc. Many of my own relatives and friends discouraged me to come to America. Especially, when I was leaving my secured job at the American Embassy. But like John F. Kenneby I strongly believe "Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly ". As such, I took the risk and came to America leaving my secured job at the American Embassy. Like many other first generation Americans, I had to struggle and work extremely hard with patience to get a footing in America. There were many moments when the loneliness and hardship seemed unbearable. But my faith, prayer and the thoughts of my children's future helped me through those difficult times. My patience and hard work paid off. I was able to get a footing in America and was able to bring my family within two years in 1977. My brothers and their families, my wife's mother, brothers, sisters and their families gradually joined us in America. Today, 28 years later I look back and thank God that I had the courage to take the risk of coming to America at that time with so much of uncertainty. Eventually, that decision not changed my own family's future but also changed many lives from my side of the family and from my wife's side of the family as well. This positive impact will continue through generations to come. I get overwhelmed to see the success of our families and new generations.

Old Age

After completing 22 years of service with Con Edison, my wife Violet and I are now retired. All our three children are married and have their own families and children. They have now devoted their effort to raise their own children, similarly, what our parents did for us and what we did for our children. The life cycle continues. Our role has changed from parents to grand parents. We have six grand children. We now enjoy the first step of each of our grand children, their first day at school, their birth day, communion, confirmation and their graduations. Each new arrival of grand children brings new joy, hope, promise and further strengthens our family.

Conclusion

My faith, prayer, self respect and responsibilty, love for my wife and children, family bond and community support has helped me overcome every uncertainty and doubt I encountered in my life. I must acknowledge that I received much care and support from people around me, catholic schools, churches, missionaries and my community as a whole. Which I believe had a strong role for my success in life and as to who became today. My life experience has

taught me not to only receive but also to give back There is more pleasure in giving then receiving The famous quotation by President John F. Kannedy always inspired me very much. "Ask not what your country can do for you ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can achieve for the freedom of man".

Our future generation has the opportunity to pick up the best from both cultures. My 28 years of experience in America taught me that this country is no doubt still strong and living up to its image throughout the world as the land of hope and opportunities. But there are also negative influences in this society where one can easily be misguided and derailed. It is up to us as an individual, family and community to avail the great opportunities that this great country provides and use them to our advantage. "Life consists not only holding good cards but in playing those you hold well." The American dream is still within reach of anyone willing to work hard and take responsibility. We as an individual and community have the power to define every aspect of life marriage, work, relationship with family and friends.

As a community we have to work hand in hand of effectively guide our children and to make a stronger Bangladeshi Christian community. We must be able to provide our children strong religious faith, strong family values, bond and commitments that distinguish us as a community. We must find ways to come together as a community to support and strengthen one another families and our own.

I appreciate the role Mr. Simon Gomes and his cabinet of Probashi are playing to reach out to everyone in the community and bringing us together as a community. They have done a superb job in organizing the first North American Bangladeshi Christain convention. As the first such convention, in my opinion, it was a huge success. Events like this will give our children a venue to show their talents and will promote our culture in the next generation. This will also have a positive impact in developing between our families. I encourage wholeheartedly the continuation of such events.

I strongly feel how well we care for our community is not a question of morality, but it must be done for our interest and to maintain and strengthen our identity as a Bangladeshi Christian community.

SUFFERING

Isabella Rani Dias, Jackson Heights, New York

How to make the greatest evil in our lives our greatest happiness.

Suffering is the greatest problem of human life. We all have to suffer, sometimes-small sorrows, sometimes-greater ones. We suffer from ill health, from pains, headaches, rheumatism, arthritis, from accidents, and chronic disease such as cancer, diabetes, etc. Many suffer from financial difficulties. The reason why suffering appears so hard is that first of all we are not taught what suffering is, secondly, we are not taught how to bear it, thirdly we are not taught the priceless value of suffering. It is surprising how easily some people bear great sufferings. Whereas, others get excited even at the smallest trouble. The simple reason that through suffering some have been knowledgeable about suffering and learn to bear the pain, and others have not. Suffering is not the evil we think it is. If we see that no one suffered more than the Son of God Himself, more than his Blessed Mother or more than the saints. Every suffering comes from God. It may appear to us that it came to us by chance or accident or from someone else, but in reality every suffering comes to us from God. Nothing happens to us without His wish or permission. Not even a hair falls from our head with His consent. At times I ask this questions, why does God allow us to suffer? It is simple because He is asking us to share in his passion.

When God gives us suffering, He gives us strength to bear it. If we only ask him. Many of us instead of asking for his help, get excited, and revolt. It is this excitement and impatience that really make suffering hard to bear. Each and every one of us has trouble, pain, and disappointment in our everyday lives. All these if borne for the love of God, we would get the greatest rewards. Even the greater suffering that may fall to our share time to time, became easy to bear if we accept them with serenity and patience. When we become impatient, our revolt and our refusal to accept it, then we suffer more. We see some people pass through tempest of sufferings with the greatest calm and serenity; whereas, others get irritated at the slightest annoyance or disappointment. Being calm and patience is the secret of happiness.

We have great remedy in our hands: that is prayer. We should pray earnestly and constantly asking God help us to suffer, to console us, or if it pleases Him to deliver us from suffering.

লেখা আহ্বান

পরবর্তী "তেপান্তরী"তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন।

PBCA
P.O. Box 1258, NewYork NY 10159
E-mail: Probashi051601@aol.com

মুক্তিযুদ্ধে বাঁশের বাঁশীর সুর

যোসেফ আন্তনী রোজারিও, নাগরী, গাজীপুর

নলছাটা গ্রামের উত্তর শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে যেখান দিয়ে ঢাকা-আরাকান রাস্তা চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে ঠিক সেখান হতেই রাস্তাটার উদ্ভব হয়ে দক্ষিণ মুখো ঢলে গেছে সুজাপুর ও করান গ্রাম পেরিয়ে নাগরী। এখান হতে রাস্তাটা দক্ষিণ-পশ্চিমে গতিপথ নিয়ে বাগদী, পাওরান, বিরতুল গ্রামের উপর দিয়ে এসে যুক্ত হল উলুখোলা নদী বন্দরে। রাস্তাটি আঁকা বাঁকা হয়ে সেনপাড়া, নগরভেলা, রায়র্দিয়া স্কুল এবং বাজার অতিক্রম করে অবশেষে মিলিত হয়েছে বালু ও তুরাগ নদীর সঙ্গম স্থল স্নান ঘাটে। ইহা প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতর দিয়ে কোথাও ইরি-বিরি জঙ্গল আবার কোথাও একদম নিরিবিলি এলাকার উপর দিয়ে সম্মুখ পানে চলেছে। আগরতলা (ভারত) হতে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাত্রির ট্রেনে আখাউড়া হতে নলছাটা স্টেশনে নেমে শ'দুই গজ পায়ে হেঁটে পশ্চিমে আসলে এ পায়ে চলা রাস্তায় পৌঁছত। নির্জন এ পথ খুবই সুগম, নিরাপদ ও অভয়ারণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। রাস্তার দু'ধারে স্থিতিবান খ্রীষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান জনগণ অতীব সহানুভূতিশীল মুক্তিদের প্রতি। তারা খাবার দিয়ে, শীতের বস্ত্র দিয়ে বিশেষ করে লুকিয়ে থাকার স্থান দিয়ে সহায়তা করত। ঢাকা-আরাকান সড়কের সমান্তরাল হয়েই চলে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ নলছাটা ও দড়িপাড়া গ্রামের বুকের উপর দিয়ে। ঢাকা-আরাকান রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন বাংলার সুবেদার শাহ্-সুজা যিনি এ পথেই স্বপরিবারে আরাকান পালিয়ে গিয়েছিলেন প্রাণ বাঁচতে আওরঙ্গজেবের ভয়ে। নলছাটা হতে মাটির রাস্তা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা স্নানঘাট পৌঁছে, রাত্রিতে নৌকায় বালু নদী দিয়ে অনায়াসে ঢাকার পূর্ব উপকণ্ঠে মেরদিয়া, নন্দীপাড়া, বাসাবো, মুগ্ধা, কমলাপুর প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হত। সূর্যাস্তের পর রাতের আঁধারকে সম্বল করে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার নানা স্থাপনায় গ্রেনেড বা ডিনামাইটের সহায়তায় আঘাত হানতে পারত। এমন কি মুক্তিরা সুরক্ষিত গভর্ণর হাউজেও বোমা হামলা করতে পিছপা হয়নি জীবন বাজি রেখে।

হিরণ, যার প্রক্ষালনের নাম খ্রীষ্টোফার, দড়িপাড়া গ্রামের একজন মাতৃপিতৃহীন কিশোর। বয়স হবে ১৩/১৪ বৎসর। মামার আশ্রয়ে থাকে। মামার নাম নিকোলাস কিন্তু সবাই ডাকে নিকু। তারও এক বিধবা পিসি ছাড়া আর কেউ নেই ত্রিভুবনে। নিকু রেডিও টেলিভিশনের বংশীবাদক। বড়দিনের কীর্তনে, বিয়ের মজলিশে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে, থিয়েটার নাটকে বাঁশী বাজায় নিকু। নলছাটা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে রেললাইনের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহাদাকার প্রাচীন বটগাছ বিদ্যমান। অদ্যাবধি এ বুড়ো বটগাছের নীচে পৌষ সংক্রান্তির মেলা বসে। এ মেলা হতেই নিকু একটা বাঁশের বাঁশী কিনে দেয় হিরনের হাতে। নানা বর্নের চকচকে বাঁশী হাতে পেয়ে হিরণ দারুণ খুশী। মামার নিকট হতেই বাঁশীতে নানান সুর, লয়, তাল, মুদ্রা প্রভৃতির পরিচয় ঘটে হিরণের। সে পাঠশালায় পড়া শেষ করেছিল মামার আশ্রয়ে থেকে। তারপর আর উচ্চ শ্রেণীতে বসার সৌভাগ্য হয়নি তার। বাঁশী হাতে ঘুরে বেড়ায় হিরণ এ গ্রাম সে গ্রাম। অনাথ হিসেবে সে সবার অনুকম্পা ও আদর পায়। অনেক সময় মামার অবর্তমানে খাওয়া দাওয়া চলে এ বাড়ি সে বাড়ি। নিকু সপ্তাহান্তে বাড়ি আসে। তখন মামার বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়না সে। মামা বাড়ি আসলে ভালমন্দ রসনা তৃপ্তিকর খাবারের সুযোগ মিলে। তাছাড়া মামা নতুন নতুন গান তোলার সাহায্য করে তার বাঁশের বাঁশরীতে। হিরণ নির্জনে বসে নতুন গানের সুর রপ্ত করে আয়ত্বে আনতে ব্যস্ত থাকে। অনেকদিন সেই প্রাচীন বটগাছটার শীতল ছায়ায় বসে আপন মনে বাঁশী বাজায় সে। সাঁঝের বেলা যখন হরেক রকমের ছোট বড় ও মাঝারী পক্ষিকুল বটের তলায় নেচে নেচে মনের আনন্দে বিভিন্ন সুরের তানে সৃষ্টিকর্তার স্তুতি ও জয়গানে মেতে উঠে, তখন হিরনের মনেও ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। একাকীত্বের মধ্যে সেও অন্য মনস্ক হয়ে যায়। বিশ্ব স্রষ্টার গৌরব ও প্রশংসা গেয়ে সেও তার বাঁশীতে সুর সংযোজন করে। বাঁশীর সুরে মূর্ত হয়ে সে বিমূঢ় হয়ে যায় অশ্রু সিক্ত নয়নে। রাত্রির আঁধারে পাখীদের কলকুজন বন্ধ হয়ে গেলে সে সম্বিৎ ফিরে পায় এবং ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায় ও বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে। এবার মামার নিকট হতে কয়েকটা হিন্দী ও উর্দ্দু গানের তালিম নিয়েছে! বেশ আয়ত্বে এনেছে অনুশীলন করে। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাঁশী বাজিয়ে সে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে।

পাশের ববিদের বাড়িতে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ৭১ সনের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটা শুনেও অতীব চমৎকৃত হল হিরণ। কয়েকবার চেষ্টায় গানটা তার বাঁশীর সুরে এসে গেল। এ গান বাঙালীর হৃদয়ের গান, চেতনার গান, উদ্দীপনার গান, স্বাধীকার অর্জনের গান। এ গানের উন্মাদনা মুক্তিযোদ্ধাদের হৃদয় মনে জাগ্রত করত ইস্পাত দৃঢ় উদ্দীনা স্বাধীনতার লাল সূর্য্যকে পাকিদের দখল হতে ছিনিয়ে আনার জন্য। ২৫ শে মার্চের (৭১ সনে) কাল রাত্রিতে পাকি হানাদার বাহিনী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীর উপর। চলে বাঙালী নিধন যজ্ঞ। সে যজ্ঞে হিরণের মামা নিকুর রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্রে স্বাধীনতার শহীদ হয় পাক- বাহিনীর গুলীতে। সে সংবাদে হিরণ হয়ে গেল মুক, নিথর ও নিস্তব্ধ। তার আর কেউ রইল না। সে আজ স্বজনহীন এ পৃথিবীর বুকে। আদর, স্নেহ, ভালবাসা তাকে বিসর্জন দিল। হিরণের বিরহ বাঁশীর করুন সুরে জনহীন প্রান্তরও মুর্ত হয়ে কেঁদে উঠে। নয়নের জলে বুক ভেসে যায় এবং তার দীর্ঘ শ্বাসে ভারী হয়ে উঠে প্রকৃতির বাতাস।

অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার পাক-বাহিনীকে ছোবলের পর ছোবল মেরে বিপর্যস্ত ও অতিষ্ঠ করে নাস্তানাবুদ করতে লাগল। পাকিরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাজার হাজার মানুষকে বুলেট বিদ্ধ করে, নৃসংশতার নগ্নরূপ প্রকাশ করতে লাগল। বাঙালীর দুর্দশার যেন শেষ নেই। মুক্তিরা বিভিন্ন বড় রাস্তার পুল, রেলপথের পুল, বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপনা, পেট্রোল ডিপো প্রভৃতিও ধ্বংস করছিল একের পর এক বিস্ফোরক ও ডিনামাইটের সাহায্যে। রেলপথের উপর মাইন পুঁতে পাক-সৈন্যবাহী ট্রেন লাইন চ্যুত করে তাদের দলে দলে হত্যা করতে মুক্তি বিচ্ছুরা পিছপা হতো না। পাক সৈন্যরা যত্রতত্র সেনা ছাউনি গেড়ে বাঙালি নিধন করে উল্লাস করতো। ইতিমধ্যে একদল পাক-সেনা নলছাটার রেললাইন সন্নিকটস্থ শূন্য বাড়িতে এসে ক্যাম্প স্থাপন করে। একদিন বিকালে কিশোর হিরণ বাঁশী হাতে আনমনা চলছিল সেই বটগাছের দিকে। বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই কঠোর গলায় এক পাক-সেনা তাকে কাছে আসতে বলল। কাছে যেতেই নরম সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো কাছে পিঠে কোন বাজার আছে কিনা এবং বক মার্কা সিগারেট এনে দিতে পারবে কিনা। সরলপ্রাণ হিরণ তাকে বুঝালো, অনেক দূরে নাগরী বাজার আছে, এবং বর্ষার গুদারা পার হয়ে যাওয়া আসা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ তবু শান্ত্রি তাকে ২০ টাকা দিলে সিগারেট আনার জন্য। হিরণ টাকা হাতে নাগরী বাজার গেল। খেয়া পারাপার হয়ে যাওয়া আসা করে সিগারেট নিয়ে আসতে বেলা চলে গেল। হিরণ এবার সমূহ বিপদ গুনল এবং গুড়ি শুড়ি হয়ে ঘরের বারান্দায় বসে রইল। রাত্রে দলবল সহ এক মেজর এসে উপস্থিত এবং রাগতভাবে শান্ত্রিকে জিজ্ঞেস করল হিরনের ব্যাপারে। শান্ত্রি বুঝালো ছেলেটা নিরীহ ও বুদ্ধি সুদ্ধিহীন। নচেৎ টাকা নিয়ে চম্পট দিতে পারত। রাত্রে পাকিরা হিরণকে কয়েকটা শুকনো চাপাতী হাতে দিল সঙ্গে একটু ডাল। হিরণ তা খেয়ে চলে আসার সময় মেজরের দৃষ্টিতে পড়ল হিরণের হাতের বাঁশীটি। মেজর আবার একটু আমোদে লোক এবং সঙ্গিত প্রিয়। হিরণকে বাঁশী বাজাতে বলায় অনেক ভেবে চিন্তে একটি হিন্দী গান বাজলো সে। খুশী হয়ে মেজর তাকে ঘরে বসতে বলল। বেশ সময় পার করে মেজর মদের ক্রেট খুলে মদ্যপান শুরু করল এবং অন্যান্যদের দিল। মেজাজ একটু নেশাযুক্ত হতেই মেজর হিরণকে বাঁশীতে হিন্দী গান বাজাতে বলল। হিরণ নাচের তালের সুর বাজাতেই সবাই নাচতে আরম্ভ করল এবং অবশেষে নেশায় বুঁদ হয়ে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইলো মেঝেতে। হিরণের ঘুম এসে গিয়েছিল সেও একধারে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন মেজর দলবল নিয়ে 'একশনে' বের হবো কোথায় মুক্তি বাহিনীর আড্ডা তা ধ্বংস করার জন্য। সন্ধ্যায় হিরণকে আসতে বলল বাঁশী বাজাবার জন্য।

বাঁশী হাতে হিরণ চলছে এক নির্জন স্থানে আসতেই যোশেফ, এরিক, বাদল মতি, সুজন প্রভৃতি মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ঘিরে ধরে জেনে নিল নলছাটার সেনা ক্যাম্পের সমস্ত ব্যাপার। এই মুক্তি বিচ্ছুরা হিরণকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিল আজ রাত্রে পাকিরা যখন মদের নেশায় গভীর রাতে নিস্তেজ ও নির্জীব হয়ে পড়ে থাকবে তখন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এ গানটা যেন বাঁশীতে বাজানো হয়। হিরণের স্মৃতিতে ভেসে উঠে তার মামা নিকুর হত্যার কথা, স্নেহ মমতা ও অসীম ভালবাসার কথা। এ সংসারে অনাথ সে এবং মামাই ছিল তার একমাত্র ভরসা। আজ সেই সুযোগ এসেছে পাকিদের সাজা দিয়ে মামা হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার। সেও আজ মুক্তিযোদ্ধা, সন্ধ্যায় একটু আগেই সে উপস্থিত পাকিদের ক্যাম্পে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজর তার দলবল নিয়ে হাজির হল। তারা সকলেই খুব খুশী রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। সে গ্রামের জোয়ানরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, এ হল পাকিদের বদ্ধমূল ধারণা। হিরণ রেললাইনে দাঁড়িয়ে দেখেছে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি। হিরণ জড়ো সড়ো হয়ে বসে রইলো- সে যেন কিছুই জানেনা, কিছুই বুঝে না। রাত্রে চললো পান আহারেরই হুল্লোয়। হিরণকে ডেকে বাঁশী বাজাতে ইঙ্গিত দিল মেজর। বাঁশীর সুরের তালে তালে সবাই মাতোয়ারা, সবাই মশগুল, সবাই দিশেহারা নাচতে নাচতে। অতিরিক্ত মদ্যপানের মত গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে অবশেষে নিস্তেজ ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমনি অবস্থায় রাত্রি গভীর হতেই হিরণের বাঁশী গেয়ে উঠল, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। নিকটবর্তী স্থানে ওৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধা যোসেফের দল এসে উপস্থিত হল সেখানে। পাকিদের যুদ্ধ সরঞ্জাম নৌকা বোঝাই করে তাদের নিজ আড্ডায় চলে গেল। মুক্তিদের নৌকায় বসে হিরণ তার বাঁশীতে গেয়েই চলল- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

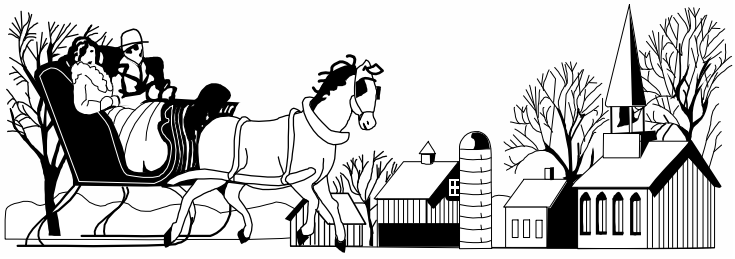

Being a Bengali Christian in the United States

John Romeo Gomes, Manhattan, NY

It is evident that in this day and age, there are many obstacles that our generation must face in order to succeed in our society. This is especially true for young Bengali Christians who are living in the United States of America. Whether we were born in America or in Bangladesh, we were all raised here and we have become Americanized. American Popular Culture has been very influential in our young adolescent lives. It is very easy for us to call ourselves American and many of us have chosen to forget where we came from.

However, there are times when young Bengalis face rejection and discrimination from their American peers. Although we consider ourselves to be American citizens, many people view us differently because of our Bengali culture. Sometimes these conflicts lead to an identity crisis for young Bengali children. This may cause some children to reject their own culture. This is natural for young children who want to fully interact with their American environment. But a rejection of culture is not necessary. Our parents are always trying to encourage us to take part in Bengali traditions and we should follow their advice as best as we can.

It is very important for us to remember that we are first and formost, Bengali children living in the United States; we are Bengali-Americans. Secondly, religion is an essential part of our lives. We should remember that our parents chose to have us baptized in the Catholic Church. And although our Motherland is mostly a Muslim country, we are part of a small but distinguished community; we are Bengali Christians. My parents taught me that "the family that prays together, stays together". This is why religion has always been a big part of my life. I am proud to be a Bengali Christian, and I practice my faith devoutly. For the last ten years I've volunteered in numerous areas of my local church community, and I have learned a great deal about myself and my faith.

Going to a Catholic school has also had a very big influence on my life. I don't believe that I would have received the same education if my parents had sent me to public school. In fact, working in the church has reinforced everything that I've learned in school. In my last three years of high school, my teachers and counselors have been preparing me not just for college, but also for a life of service. They taught me that the true meaning of Christianity is human kindness and service to others. No matter what kind of volunteer project I'm doing, I always try to remember how fortunate and blessed my life has been and that there are people in the world who are not as fortunate. This makes me realize why my parents came to America in the first place.

Our parents came to this country to give us a better life. Living in America is not our right, it is our privilege. Our parents could decide to send us back to Bangladesh at anytime in our lives. But instead they *choose* to work multiple jobs in order to make sure that we have every opportunity to succeed in this country. We often forget that living in this country, as free citizens or residents, is in fact the biggest opportunity of our lives.

It is also very easy for us to ignore or disobey our parents. We choose not to listen to them because we believe that they are too strict or too demanding. But in reality, there are millions of parents in the world who are even stricter than our own parents. We should try to understand that everything our parents do is for our own good. I know that sometimes our parents can be a little too demanding or stubborn, especially when it is about our college or career choices, but instead of arguing and yelling with them, it is best to be reasonable and talk to our parents.

In my fourteen years of living in America, I've heard many parents say that they want their children to become doctors or lawyers. For many children, this is not going to happen. Not everyone can become a doctor or lawyer. The fact is, there are too many fields of study to pursue and each person must pursue their own field of interest. Personally, my father always wanted me to be a medical doctor. But the medical field was never really my passion. Since I was seven-years-old I have been preparing myself for a career in Fine Arts and Computer Science.

Recently my father realized that I'm not a child anymore and he trusts me to be able to make my own decisions. After many years he has finally accepted that I will pursue a career of my own choice. I always tried to be reasonable and patient with my parents and it finally payed off. As I stated earlier, it is always best to talk to our parents instead of arguing with them.

There will always be many obstacles for young Bengalis as we move into the future. But there are ways to overcome these obstacles and these solutions begin in our very own homes. Our family and friends will always be an important part of our lives. Whenever we must face an obstacle, we should approach it with help from the people we care about. Our parents can always be a great source of help and advice. Even though we might feel uncomfortable talking to our parents about certain issues, they are always there to help us and they probably know what we are going through. It's always a good idea to talk to our parents and let them know what's going on in our lives. If a family really wants to work successfully then they should eat together, talk together and pray together. Communication is the most important thing for a family.

As Bengali Christians we should all live our lives in service to others. It is necessary to help others any way that we can. It is what Jesus Christ wanted us to do and after all, He did everything for us. It is never easy to live a life full of human kindness because of all the expectations that people have for us. But the best way to start is by respecting others regardless of their beliefs or background. Just as we want to be accepted by other people, we should accept each other as our friends.

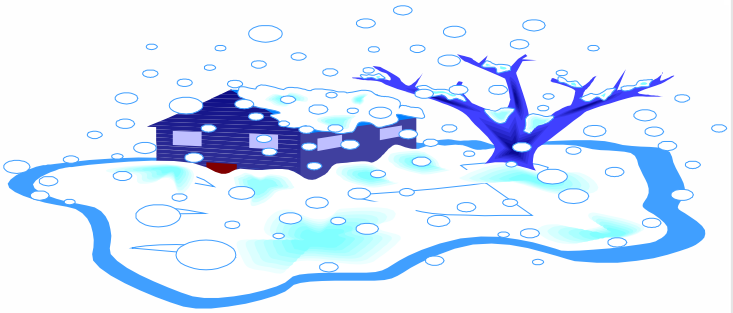

Conflicting Cultures

Sylvia D'Costa, Valley Stream, New York

I am writing this article for all the teenagers and adults who feel torn between two cultures. The two cultures that I am obviously referring to, is American culture and Bengali culture. I myself was born and raised in America, and have genuine pride for this country. At the same time, I was blessed to have Bangladesh as my "Mother Country", representing my unique heritage. I am lucky to have both of these two cultures in my life, but I have to say that it more then leaves me confused. It is easy for traditional Bengali's to advise the new generation that " Even though you live in America, you are not American. You are still Bengali ". But I have to ask, how can you live in this country for so long, raise your children here, become a citizen, and still not call yourself an American? I honestly don't understand it. If you look real hard, you can see that some of us who are part of the new generation are trying hard to uphold and respect both cultures. Why do we have to uphold American culture, as well as Bengali culture? Let me explain. In this country, you are frowned upon for not practicing American culture. You are judged by the way you dress, the way you speak, and the way you carry yourself. It is the same for almost every country, but I feel like it's more emphasized in the U.S. We become victims to this image that society demands from us, in order to be accepted. At the same time, the Bengali community frowns at our "American ways". They say that we don't want to understand and respect our Bengali culture. I disagree. Because we live in America, it is not surprising that we should practice the American culture. Meanwhile, the traditional Bengali's should try to understand that sometimes it's difficult for us to fully appreciate our Bengali culture and heritage. It is why we need our parents and family members to remind us of our Bengali culture, and to help us understand it better. Maybe if this is done, Bengali culture might be practiced more often. But this situation can only be improved if it is first acknowledged as a problem. So, I end this article, hoping that I have cleared your minds and created a new path for you to ponder over, if not to follow. Just remember that culture is important, and it describes who you are and where you came from. Without it, you are nothing.

লেখা আহ্বান

পরবর্তী "তেপান্তরী"তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় অতি সত্বর পাঠিয়ে দিন।

PBCA
P.O. Box 1258, NewYork NY 10159
E-mail: Probashi051601@aol.com

My Bengali Life

Andrew Rozario, Connecticut

My name is Andrew A Rozario, I am a 6th grader. 1! years old going to a new school named Sedgwick Junior High. I graduated from Louise Duffy Elementary. Believe it or not my school system ranked number one in the state of Connecticut. If you're looking for a good school give me a call so I can have a Bengali friend. I am an average Bengali kid, and I don't really ever get made fun of in school or in social gatherings, but at times I can feel that I am different than most of the kids in my class. Like any other kid I love to play around. I don't get to go to Bangladesh a lot, so I try to attend every PBCA gatherings. Where I get a taste of Bangladesh in America. One of the best gatherings is Christmas Carol (kirton). 1 love the sound of the `Dhol' (the drum) I would like to learn how to play Indian musical instrument, but it is hard to find a teacher where I live. Growing up as a Bengali American in this country, I am challenged with many tasks, as I am growing; for instance, growing up in a town where there are no other Bengali kids to share or vent ideas or experiences with. It's great to have PBCA gatherings where I can see my cousins and other Bengali people. This keeps me in touch with my Bengali culture, language, and all my distant relatives. I have many friends in school - they are very interested in my culture, so for a class project I did a verbal report on Mohandas (Mahatma) Gandhi. The kids and my teacher loved my report and I got a (A+) on it. I also got involved with Global Culture Studies where we dress up as our native culture clothes and share one of our native culture foods with our classmates. I love being a Bengali American because I have best of both worlds. This year I am looking forward to attend the first Bengali convention. Where I intend to participate in various events. I hope there will be some sixth grade students from Bangladesh participating in this convention, so I can learn their interests, lifestyles, education system and share ideas. I am determined to be an active member of Probashi Bengali Christian Association, and I hope you will do the same. Together we will grow and have lots of fun.

সম্মেলনের ভিডিও

নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত ১ম বাঙ্গালী খৃষ্টান সম্মেলনকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় নিপুন শৈল্পিক ছোয়ায় ভিডিও বন্দী করেছেন প্রবাসীর দক্ষ ফটোগ্রাফারগন। এই ঐতিহাসিক 'আনন্দমিলন'–এর ১ কপি (২টা ভিডিও) আজই অর্ডার করুন। কালের প্রবাহে এই আনন্দ মিলনই হবে আমাদের আনন্দ স্মৃতি।

মূল্য – ১ কপি (২টা ভিডিও) ২৫.০০ (পঁচিশ ডলার) মাত্র। চেক পাঠাতে হবে `PBCA' নামে।

চেক পাঠানোর ঠিকানা ঃ

PBCA P.O. Box-1258, New York, NY 10159

Phone (917) 767-4632, (646) 773-7790

THE TERROR TRIP

Maria Rozario (Palkie), Virginia

We were on our way to North Carolina for summer vacation. When we reached Raleigh, a huge storm slowly approached us. My dad said that it was too hard to see and had to stop the car. Since it was pretty cold outside, my mom said we have to take shelter somewhere. The street was entirely barren, except one Victorian styled house on the top of a rocky hill. While my dad was going up the hill, he got a flat tire, which worked, perfectly for the misfortune we were already going through. We walked up to the old fashioned home and rang the doorbell. A young beautiful girl opened the door. As my mom explained the situation we were in, I noticed that the girl had a massive lump of cloth tied around her waist. She then welcomed us in with great sympathy. She said her name was Gabriella. We could call her Gabby. As we entered the enormous house, my sister and I realized everything was gothic. It had a large red carpet and a chandelier. All of a sudden she lit the chandelier. The room became illuminated. Gabby put us in our rooms and it seemed like she didn't want to leave us alone. It seemed to me that she was very lonesome and liked our company. My sister and Gabby got along great and soon became friends. She was closer to my sister's age and since my sister is very friendly, they seemed to get along well.

The Next morning was bright and crispy. It was time for us to move

on. I became curious, as always, and asked Gabby, why she had the large piece of cloth rapped around her waist? I expected her answer, but got none except she stared at me with a blank face. We left the house and headed for the coast, but promised her that we would come back to bid her farewell, on our way back home. A week later we were traveling back to Virginia, we went to that house, where we were sheltered so kindly and rang the doorbell! To our surprise a very old women came and asked who we were? We said that we are friends of Gabby and we have brought some gifts for her! Horror filled her eyes and she let us in!

She said that she was Gabby's mother and that Gabby had died sixteen years ago. She thought we were out of our minds. I could feel blood rushing up my spine and my sister gulping very loudly. My parents didn't believe and thought the old lady was nuts! We went outside to the porch where we found, to our surprise, the piece of cloth that was tied around the girl's waist, but it was soaked with blood; we noticed a note tied to the piece of cloth. The note said, "I had a great time this death anniversary. I was so lonely the last fifteen years! Thank you very much. Hopefully I'll see you next year"!

Gabby's mom explained to us that the day we took shelter in her house was her death anniversary and Gabby had a piece of cloth tied around her waist because she died in a cruel accident, and that she had fallen under a train, and was sliced into half. The old lady was out of town on her death anniversary this year. Afterwards we were scared to talk amongst ourselves of this strange episode we just experienced and drove back home in silence, thinking of Gaby, unfortunate Gaby.

আর্মানিটোলার আর্মেনিয়ান সাহেব

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও, উডব্রিজ, ভার্জিনিয়া

আর্মানিটোলায় সাহেবদের কুটিতে পার্টি লেগেই থাকত। পাস্কা পরবে এবং বড়দিনে বড় পার্টি হতো। বছরের শেষ দিনে সারারাত পার্টি হতো, অনেক বাদ্য বাজত, অনেক বলড্যান্স হতো সাথে থাকত খানাপিনা।

এক পার্টির কথা আমার মনে আছে। ডিব্রু সাহেবের একমাত্র মেয়ে শীলার বিয়ের পার্টি। শীলা যেমনি সুন্দরী ছিল তেমনি ছিল তুখোর ছাত্রী। ওর সাথে প্রেম হলো এক কাথলিক এ্যাংলো ছেলের সাথে। নাম তার টেডি বালো। টেডি বালো আমাদের ধর্মপল্লীর বাসিন্দা এবং লক্ষীবাজারের ছেলে। দেখতে খাঁটি ইংরেজদের মত। বৃটিশ কোম্পানীর ম্যানেজার। সকলেই খুশী, কিন্তু যেহেতু কাথলিক সেহেতু আর্মেনিয়ানরা খুবই ক্ষুব্ধ। সমস্যা দাঁড়ালো কোন গীর্জায় বিয়ে হবে। বিয়ে নিয়ে তোলপাড় শুরু হওয়াতে, টেডি বালো, শীলাকে নিয়ে কোর্টে বিয়ে করে। দার্জিলিং এ মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে একদিন উধাও হলে গেল। ঢাকার জনগণ একটি বিয়ের পার্টি উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হলো।

অনেক খরকুটা জ্বালিয়ে, ডিব্রু সাহেব কন্যা জামাইকে এনে, তাদের গীর্জায় বিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে, ঢাকা ক্লাবে পার্টির আয়োজন করলেন।

ঢাকা ক্লাবে তখন বেশীরভাগ সদস্য পাকিস্তানী পাঞ্জাবী ছিল। অনেক বৃটিশ এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিল। ঢাকার নবাব পরিবারের অনেক সদস্য ছিল। ব্যান্ড ছিল এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কাথলিকদের, ব্যান্ডের মেজর ছিলেন লক্ষীবাজারের মিকি সোলে। সেই বৃহৎ মিশ্র বিবাহে ঢাকার গণ্যমান্য প্রায় সকলেই আমন্ত্রিত ছিলেন। যেহেতু বাবা সরকারী চাকুরী করতেন, তাই তাকে আপ্যায়নের ঘোষক নিযুক্ত করা হল, কারণ তিনি সরকারী উচ্চপদস্থ আমলদের চেনেন।

গভর্ণর ফিরোজ খান মুন এলেন, তার স্ত্রীকে নিয়ে, ভিকারুনেসাই ঢাকার হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কাথলিক ক্যাথিড্রাল তখন লক্ষীবাজারে, সেখান থেকে পালক ফাঃ এ্যসকিন, ব্রাঃ এলিসিয়াম, তেজগাঁ থেকে ব্রাঃ হউজিম। কাথলিক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং এম, এল, এ রবার্ট গমেজ সংঘের সেক্রেটারি এবং ঢাকার স্কাউট কমিশনার এ, পালমার এবং অর্থমন্ত্রানলয়ের উপসচিব বি, কে, গুড এলেন; কংগ্রেসের সেক্রেটারি ও এম, এল, এ, পিটার পল গমেজকে বাবা সাথে নিয়ে, তার বস, ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডঃ এলিস সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের শেষ বৃটিশ প্রধান বিচারপতি ডঃ এলিস চিরকুমার ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেনসেলর ডঃ সিমসনকে খুব সম্মানের সাথে বাবা গ্রহন করে ডিব্রু সাহেবের কাছে নিয়ে আসলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান ডঃ টার্ণার এবং একই বিভাগের অধ্যাপক রবার্ট গমেজকে ছোট্টখাট অভিনন্দন বক্তব্যের জন্য অনুরোধ করা হল।

ব্যান্ডের দলে একজন বাঙ্গালীকে দেখে খুবই আনন্দ লাগল, তিনি পিয়ানো এবং অর্গান বাদক এন্ড্রু গমেজ তিনি ইক্রাশী গ্রামের এবং কোলকাতায় থাকা কালে পিয়ানোর তালেম নিয়েছিলেন। তার বড় মেয়ে আমার পিতার ধর্মমেয়ে তাই ওদের সাথে আমাদের সখ্যতা ছিল। আমি এন্ড্রু কাকা বলে ডাক দিতেই তিনি ধমকের সাথে, ইংরেজীতে আমাকে আংকেল বলতে বল্লেন, আমি কাচুমাচু হয়ে কিচেনের দিকে এগুতেই, আমার গ্রামের অনেককে ভীষন ব্যস্তভাবে কাজ করতে দেখতে পেলাম। সকলেই আমাকে স্নেহের সাথে কথা বলে একটা পেষ্ট্রি খেতে দিলেন।

ঢাকার গোয়েন্দা শাখার প্রধান ডানিয়েল সাহেব আসলেন, তার স্ত্রী ছিলেন আর্সেনিয়াম, ডানিয়েল ছিলেন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং বিলাত থেকে আই-সি-এস পাস দেয়া।

বৃটিশ শাসনের আড়াইশ বছরের ইতিহাসে, ডানিয়েলই একমাত্র কাথলিক আই-সি-এস অফিসার ছিলেন। গোটা চল্লিশজন মুসলিম আই-সি-এস, যার মধ্যে মাত্র পাঁচজন বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। বাকী সব হিন্দু প্রশাসক ছিলেন। ঢাকার সব স্কুলই তখন, সব জেলা হাই স্কুলের মত একটি বোর্ডের অধীনে ছিল - যার নাম ছিল দি ক্যালকেটা স্কুল বোর্ড, পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ববাংলা আসাম ও বিহার সহ এর ব্যপ্তি ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু পন্ডিত সমাজকে স্তম্ভিত করে, ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের কাথলিক ছাত্র, প্রকাশক ডানিয়েল সাহেবের জ্যেষ্ঠ, সুযোগ্য পুত্রধন - হেক্টর রুবার্ট - ডানিয়েল, মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'টি স্বর্ণপদক লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

সবশেষে দারি-মোছ ওয়ালা বিত্তশালী আরমেনিয়াম সাহেবরা প্রবেশ করেন। লাজার, জাভেস, স্টাভেজ, রোবেজ পরিবারগুলো আসতেই ব্যান্ড বেজে উঠল। ঢাকার স্বনামধন্য দৈনিক মর্নিং নিউজের এডিটর কাথলিক হেপোলেট সাহেব তার পরিবার সমেত এলেন এবং তার সাংবাদিকদের ফটো তুলতে নির্দেশ দিলেন।

কেন্দ্রিয় সরকারের সচিব এ, ডি পাওয়ার সাহেব এবং কর্ণেল জেকোব এলেন - দুজনই আমাদের ধর্মপল্লীর কাথলিক ছিলেন। মরোনা বাড়ীর জামাই উইল্‌স সাহেব এবং সুদর্শন যুবক নবাব আসকেরী এলেন। পুরাতন ঢাকার ধনকুবের হাফেজ মুনির হোসেন সাহেব এসে করমর্দন করে বিদায় নিলেন। হাফেজ সাহেব, আর্মানীটোলতেই বসবাস করেন এবং আর্মেনীয়ামদের কাছ থেকে তিনি প্রায় একসাথে ত্রিশটি বসতবাটি ক্রয় করেন। এখনও তাঁর পরিবার চিনের সাথে যুক্তভাবে পাঁচটি বৃহৎ শিল্প স্থাপন করেছে। তার পরিবার এখন লাজার সাহেবের সিংহ মার্কা বাড়ীতে বসবাস করেন, সেই বাড়ীর গ্যারেজে এখনও বৃটেনের রানীর ঢাকা সফরের ক্যাডিল্যাক গাড়ীটি আছে; হাফেজ সাহেব জেদ বজায় রাখার জন্য -নিলামে ষাট দশকে, আট লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলেন, ঢাকার বাঙ্গালীরা সেদিন আনন্দে অনেক বোমা ফুটিয়েছিল।

ভীষণ আওয়াজ করে ব্যান্ড বেজে উঠল, আমি দেখতে পেলাম খাট একজন টাকুকে, বাবা খুব সন্মান করে এগিয়ে আনছেন, নবাবসহ, সবলেই কুর্নিসের কায়দায়, তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তার নাম মিঃ মানুক। আরসেনিয়ানদের মাঝে তিনিই সর্বাপেক্ষা ধনবান ব্যবসায়ী। লোকে তাকে আর্চ বলে ডাকত।

মানুক সাহেবকে সকলেই সন্মান করত। তবে কম সংখ্যক মানুষ তাকে ভালবাসত। তার খুব একটা বন্ধু-বান্ধব ছিল না। তিনি ঢাকা এবং ময়মনসিংহের উৎকৃষ্ট তোষা পাট ইউরোপে চালান দিতেন। তার অধীনে দুশ লোক কাজ করত। এখনকার বঙ্গভবনই ছিল তাদের বসতবাটি। বৃটিশ প্রশাসন তার বাড়ীটি ক্রোক করে গভরমেন্ট হাউজ স্থাপন করে।

মানুক সাহেব খুবই কৃপণ ছিলেন এবং খুব একটা দান-দক্ষিণা করতেন না। তার মেজাজ সর্বক্ষণই রাগান্বিত থাকত। এত বিত্তশালী হয়েও তার এক গরীব বোনকে তিনি সাহায্য করেননি, তার কারণ তার বোনটি কাথলিক মন্ডলীর সদস্যা হয়েছিলেন বলে। মানুক পরিবার যশোরে, নীল চাষের ব্যবসা করে, অনেক বাঙ্গালীর জীবন বিষময় করে নির্যাতন চালাতেন। তার ছেলেদের স্বভাব চরিত্র খুবই নেক্কারজনক ছিল এবং এক ছেলে, সরিষাবাড়ীতে এক গ্রাম্য রমণীর অভিযোগে, গ্রামবাসীদের হাতে গণপিটুনির মাধ্যমে অকালে প্রাণ হারায়।

অনেকদিন পড়ে বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে ডিব্রু সাহেবকে বিদায় জানাতে গেলেন। তখন আমাদের খুবই খারাপ লাগছিল। অজান্তে আমরা ডিব্রু এবং তার পরিবারের সদস্যদের হৃদয়ে স্থান দিয়ে ফেলেছি।

ইউরোপে চলে যাবার সময়, আমাদের সাথে দিনটি কাটালেন। বাবাকে বল্লেন তিনি যেন, ঢাকা ওয়ার্ডাস ক্লাবের ফুটবলের খবরগুলো তাকে লিখে পাঠান। সে সময় ঢাকা ওয়ার্ডাস ক্লাব পরপর চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, ডিব্রু সাহেব ছিলেন ক্লাবের বোর্ড মেম্বার। বাবা সেদিন কোন কথাবার্তাই বল্লেন না। ডিব্রু আমার মাথায় হাত রেখে আদর করলেন, পকেট থেকে একটা সোনার গিনি আমার দিকে দিলেন, আমি হাত বাড়িয়ে যেই নেব, তখনই তিনি বিশেষ কায়দায় উপরের দিকে ছুড়ে মারলেন এবং মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই, নিজ জুতো দিয়ে চাপ দিয়ে রাখলেন। তিনি আমাকে গিনিটা নিতে বল্লেন, কারণ সেটা তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমি অনেক কষ্ট করেও ডিব্রু সাহেবের জুতোর তলা থেকে সেটা বের করতে পারলাম না। আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল এবং ঘেমে উঠেছিলাম। আমার ব্যর্থতার জন্য এবং এই হয়রানীর জন্য তখন আমার কান্না পাচ্ছিল।

একে একে আমরা তাদের হাত চুম্বন করে ডিব্রু সাহেব এবং তাঁর সহধর্মীনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, শেষবারের মত ফিটন গাড়ীতে উঠে বসলাম, অনেক সুখময় স্মৃতি মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে উঠছিল। ডিব্রু সাহেব জানালা দিয়ে, আমার হাতে সোনার গিনিটি দিয়ে বল্লেন, জীবনে অর্থ উপার্জন করা বড়ই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। (সমাপ্ত)

দাদুর সলা (এক)

সুশীল জন গোমেজ, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

আদুরে নাতি-নাতনীরাঃ

আনন্দঘন বড়দিন ও শুভ নববর্ষ তোমাদের জন্য বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ ও সমৃদ্ধি। এই মহান দিনে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যেন চলার পথের পাথেয় করে নিতে পারো শিশু যীশুর আদর্শকে। খুব খুশি খুশি লাগছে, তাই না? নতুন জামা-কাপড় পরেছ, আরও কত কী উপঢৌকন! তারপর রয়েছে মজার মজার খাবার, বড়দিনের কেক। আমাকে না দিয়ে খেলে কিন্তু ভীষণ রাগ করব, গাল ফুলিয়ে বসে থাকব, অভিমান করে। এই সুন্দর দিনে তোমাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। তোমরা বড় হও, চিরজীবী হও, চিরসুন্দর হও!

অনেকদিন থেকেই তোমাদের কিছু বলি বলি, লিখি লিখি করে মনটা আকুপাকু করছিল। শেষ অব্দি এ আকুপাকুই যে এই বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো হয়ে চেপে বসবে, কে জানতো! বসে তো গেল, এখন কী বলি, কী করি, কী লিখি, তা নিয়ে বাঁধলো বিরাট এক খট্‌কা। কিছু স্থির করতে পারছিনা। এ অবস্থায় তন্দ্রাদেবীর হাতের ছোঁয়ায় আমার নয়নযুগলে নেমে এলো ঘুমের আমেজ। খানিক পরেই দেখি, তোমরা এসে আমাকে ঘিরে ধ'রে বলছ, "দাদু, আমাদের বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলো!" অমনি এক ঝট্‌কায় কেটে গেল সব খট্‌কা। কলম নিয়ে বসে পড়লাম। কিন্তু, হায় হায়! নিজের ঝুলি তো খালি, কী বলতে কী বলি! তাই অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে ধার-করা দু'টি লাইন দিয়েই শুরু করলামঃ "মোদের গরবো মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।"

হাঁ তোমরা তো জানো, যে-দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করি, যে-দেশে আমাদের পিতা-মাতা-পিতামহ-মাতামহ, সকল রক্তের আত্মীয়, আত্মার জন্মগ্রহন করেছেন সেই দেশ আমাদের জন্মভূমি বা মাতৃভূমি। এবং আমরা যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি, তা হ'ল ভাষা। জন্মের পর মায়ের কাছ থেকে যে-ভাষার কথা বলতে শিখি, তা-ই মাতৃভাষা। আমরা যেহেতু প্রথম বাংলা ভাষার কথা বলি, বাংলা তাই আমাদের মায়ের ভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা। তো, এই বাংলা ভাষা কখন, কীভাবে, কী থেকে জন্ম নিল? এর উত্তর দেয়া খুব সহজ নয়। তবে পন্ডিত বা ভাষাবিদ্‌গণের মতে, অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম, চর্যাপদ-এ বাংলার সেই আদিরূপের নিদর্শন আছে।

কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, এই অপভ্রংশই বা এলো কোথা থেকে। আমার জানা মতে, অপভ্রংশের জন্ম হয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার থেকে, যেমন, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরশেনী, পৈশাচি ইত্যাদি। এই ভাষাগুলি থেকে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের সবগুলি আর্যভাষা, যথা- হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি, নেপালি, আসামি, ওড়িশি, ব্রজভাষা, মৈথিলী, পূর্বী ইত্যাদি এবং সিংহলী ভাষার উদ্ভব হয়েছে। তবে বাংলা ঠিক কোন্ প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে সে-বিষয়ে পন্ডিতেরা একমত নন। কারো কারো মতে মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলার জন্ম, কেউ কেউ মনে করেন শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে। এই প্রাকৃত ভাষাগুলি আবার ছিল বৈদিক সংস্কৃতের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূত্রে, অন্যান্য ভাষা থেকেও শব্দ-উৎপাদন এসেছে। যেমনঃ- বাংলা ভাষার শতকরা চুয়াল্লিশটি শব্দ কোল বা মুন্ডাগোষ্ঠীর যথা- কানা, হাবা, বাসি, ডাব, ব'াশ, লুঙ্গি, তালই, আমই, বঙ্গ, ডবাক। তিব্বত ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দও বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে যেমন- দার্জিলিং, ভোট, চটি, লামা ইত্যাদি। দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এসেছে যেমন- মীন, নীর, মলয়, উলু, পিলে, মোট ইত্যাদি। আর আমাদের দেশী কিছু শব্দ যেমন- খসু, বেঙ্গ, পিম্পড়ি, বাদিয়া, খড়কী, ঢাকাই, চোঙ্গা, চাটাই, ইত্যাদি। পৃথিবীর যে কোন সজীব ভাষাই যেমন অন্য সকল ভাষা হ'তে শব্দচয়ন করে নিজের দেহ পুষ্ট করেছে বাংলাভাষাও তেমনি কোল, মুন্ডা, দ্রাবিড়, চীনা, সংস্কৃত, তিব্বতী, আর্য, মাগধী, প্রাকৃত, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, আরবী, পার্শী, ইংরাজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, তুর্কী, তাতারী, জাপানী, মালয়ী, গুজরাটি, মারাঠি আরও অনেক ভাষা হ'তে শব্দ সংগ্রহ করে আপন চাহিদা পূর্ণ করেছে।

আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের বিখ্যাত ভাষাবিদ্ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যা-পদের রচনাকাল হ'ল খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দী হ'তে ১২শ শতাব্দী, তবে ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১১শ হতে ১৪শ শতাব্দী। বাংলা ভাষা সেই হিসাবে পৃথিবীর আধুনিক ভাষার তুলনায় অর্বাচীন ভাষা নয় (মনে রাখতে হবে যে আধুনিক ইংরেজি ভাষার আরও পরে ১৪শ শতাব্দীর দিকে)। অন্যদিকে, বাংলা ভাষা এখন পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা। এ কী আমাদের কম গর্বের কথা! আরও আনন্দের কথা এই যে, সম্প্রতি (ইউ এন ই এস সি ও) ইউনেসকো ৫২'র ভাষা-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। কী? এতে তোমরা গর্বিত নও? তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে কবি শামসুর রহমান অবধি কত শত বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে ব্রতী হয়েছেন, ত'াদের নামের তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই এ-লেখাকে শুধু পটভূমি হিসাবে ধরে নেবে। সুযোগ পেলে আস্তে ধীরে তোমাদের বিস্তারিত জানাতে চেষ্টা করব।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ত'ার গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ (দ্য সঙ্গস্ অফারিং) এর জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম এশিয়ান, যিনি নোবেল পুরস্কার পান। তার পর হ'তে বাংলা ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা শেখা ও জানা গর্ব ও সুনামের বিষয়। যে যত ভাষা আয়ত্ব করতে পারবে সে তত কৃতিত্বের অধিকারী হবে। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, ভাষাবিদ্ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লা অনেক ভাষায় লিখতে-পড়তে এবং বলতে পারতেন। কারো কারো মতে ১৮টা ভাষায় ত'ার যথেষ্ট পান্ডিত্য ছিল। তাছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যক্তিই বহু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। প্রসঙ্গত রস-সাহিত্যিক ডঃ সৈয়দ মুস্তবা আলীর কথাও বলা যায়। তিনিও ১৫/১৬টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বাংলা ভাষা সর্বদাই ছিল বৃহত্তর বাংলা প্রদেশের প্রথম এবং প্রধান ভাষা। আফগান/মোগল আমলে আদালতের ভাষা ছিল ফার্সি, মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। ইংরেজ আমলে ফার্সির বদলে ইংরেজীকে আদালতের ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু মানুষের মুখের এবং সাহিত্যরচনার ভাষা বাংলাই থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে, বাংলাই ছিল "প্রথম" ভাষা, ইংরেজী বা সংস্কৃত "দ্বিতীয়" বা "তৃতীয়" ভাষা, তাছাড়া মুসলমান শিক্ষার্থীরা আরবি ও ফার্সি শিক্ষা করত। নানা কারণে হিন্দুরাও ফার্সি শিখত তখন। পাকিস্তান আমলে, প্রথমে বাংলা ও ইংরেজী ১ম ও ২য় ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তার উপর জোর করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা, এবং তাদের ধামাধারী কিছু বাঙালী বিশ্বাসঘাতক, উর্দু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তার প্রতিবাদ-স্বরূপই জন্ম হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ গর্ব, ভাষা আন্দোলনের। তাই, তোমাদের প্রতি আমার আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ, তোমরা প্রবাসেও বাংলা ভাষা তথা তোমাদের গৌরবময় মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান দিবে, এবং ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করবে। আমরা যেন কোনক্রমেই ভুলে না যাই যে বাংলাদেশ আমার দেশ, বাংলা ভাষা আমার ভাষা।

সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, নির্জন কবি জীবনান্দ দাশ, পল্লীকবি জসীম উদ্দিন্, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কমলকুমার মজুমদার, শওকত ওসমান, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিখ্যাত ভাষাবিদ্ ও পন্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মৌলানা আকরাম খ'া, ডঃ সুকুমার সেন, নোবেল-বিজয়ী অর্থনীতিজ্ঞ অমর্ত্য সেন প্রমুখ।

রূপসী বাংলার কবি জীবনান্দ দাশ নানা রূপে বাংলা মা-কে এঁকেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমির বন্দনা করতেন এইভাবেঃ- "বন্দেমাতরম্, সুজলাং সুফ-লাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যেই রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার রূপ। দ্বীজেন্দ্রলালের "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানে রয়েছে বাংলা মায়ের স্নেহশীতল রূপের ছবি। তারই গানে আছে, "এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বর্গ সমান।" বিদ্রোহী কবির গানে এই মাতৃভূমীর প্রতি বিদেশী প্রভুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আর পল্লীকবির "নিশিতে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা" আজও বাংলার ঘরে ঘরে আবেগের সঞ্চার করে। আর ভাষা-শহীদদের স্মরণে আব্দুল গাফফার খানের লেখা ও শহীদ আলতাফ মাহমুদের সুর দেওয়া গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" এখনও পর্যন্ত বাঙালির চোখে অশ্রুসঞ্চার করে। বস্তুত, এমন গানের দেশ এমন প্রাণের দেশ পৃথিবীতে আর আছে কিনা আমার জানা নেই।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ্ সাহেব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় আগমন করেন এবং সেই দিনই রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দান করেন। নানা-সময়ে, নানা-ভাবে ঘ'া খাওয়া বাঙালিরা ভবিষ্যতের অনেক আশা-আকাংখা ও উদ্দীপনা নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে জমায়েত হন। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব যখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। তখন শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণের মনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও দারুণ সন্দেহের উদয় হয়, যে আসলে পশ্চিমারা আমাদের মঙ্গল চান না, বরং আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বকে গলা টিপে হত্যা করতে চান। তখনই, ছাত্রসমাজ গর্জন করে উঠলো "না"। সাথে-সাথে সেই গর্জন উপস্থিত জনসমুদ্রের প্রতিটি কণ্ঠকে মুখর করে তুললোঃ "না"-"না" "না" "না" "না"। এই প্রবল প্রতিবাদের মুখে জিন্নাহ্ সাহেব ভড়কে গেলেন এবং কোনমতে ভাষণ শেষ করে, সভা ত্যাগ করলেন। তখন থেকেই বাঙালির বুকে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হ'লো এবং এই বীজই পরবর্তী সময়ে অঙ্কুরিত হ'য়ে স্বাধীনতা ও ভাষা-আন্দোলনের সূচনা করলো। এই আন্দোলন ও সংগ্রামের পৌরোহিত্ব বা কৃতিত্ব যা-ই বলি না কেন, তা বাংলার দামাল ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতি এবং স্বাধীনতাকামী জনতার। যার ফলশ্রুতি ৫২'র ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৬ সালে জিন্নাহ্ সাহেব ঘোষিত, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কলকাতার বুকে এক ভয়াবহ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে এবং এই রক্তারক্তি, কাটাকাটি, হানাহানি, জ্বালানি-পোড়ানি সারা ভারতের অলিতেগলিতে ছড়িয়ে পরে, যার দরুন, লক্ষ-লক্ষ, নিরীহ নর-নারী প্রাণ হারায়। জিন্নাহ্ সাহেবের এই চক্রান্ত ও হঠকারিতা সমগ্র ভারত ও বাংলার বুকে যে কলঙ্কের অধ্যায় রচনা করেছিল, তা বিশ্ব-বিবেককে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। এইভাবে, ১৯৪৭ সালে ইংরেজের বেড়াজাল কেটে স্বাধীন হলেও, আমরা বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে আবারও এক প্রবঞ্চনার শিকার হ'য়ে পরাধীন জীবন যাপন করতে শুরু করি। আমরা হ'য়ে যাই তাদের হাতের ক্রীড়নক। ভৌগোলিক অকস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, সবকিছুতেই পশ্চিমাদের থেকে ভিন্ন, শুধু নাগরিকত্ব এক। শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে পরিস্কার হ'য়ে যায় যে এই পশ্চিমারা বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। তাই গোড়া থেকেই তারা বাঙালী জাতির শিকড় কাটতে শুরু করে। একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হ'লে সে-জাতির ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয়। তাই তারা শিশুসাহিত্যে ও পাঠ্যপুস্তকে বাংলা শব্দের পরিবর্তে আস্তে-আস্তে উর্দু, ফার্সি ও আরবি শব্দ সংযোগ করতে থাকে। রবীন্দ্র সাহিত্য, গান, সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। নাটক ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাসমূহের উপর আনা হ'লো নানা বিধিনিষেধ। মৌলবাদ স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রবিরোধী নাটকের অভিনয় হ'ল নিষিদ্ধ। শুরু হ'ল বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপর নির্যাতন, জেল-জুলুম, হত্যা।

১৯৫২'র ফেব্রুয়ারিতে আবারও নাজিমুদ্দিন সাহেব উর্দু ভাষাকে পুরো পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালীরা ক্রোধ, আক্রোশ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। জনাব নোয়াব আলী সাহেব বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব দেন। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের নানা স্থানে শুরু হয় প্রতিবাদ, মিছিল, জনসভা। এক পর্যায়ে সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, এবং ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায়, পুলিশ মিছিলের উপর গুলি ছুঁড়লে, বাংলার দামাল ছেলে সালাম, বরকত, জব্বার ও রফিক নিহত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দেশের মানুষ তাদের মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে প্রাণ দিল। এবং এই সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব। এরপর থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার আগ পর্যন্ত প্রতিবছর রক্ত দিয়েছে বাংলার মুক্তিকামী সন্তানেরা। ৬৯-৭০-এর গণঅভ্যুত্থানে তেমনি নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক কৃতী ছাত্র আসাদ। শেষে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সারা দিয়ে সকলে দল-মত সবকিছু ভুলে গিয়ে এক পতাকা তলে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে, এবং ৭১'র ১৬ই ডিসেম্বর, তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তলাল সূর্য। আমার অনুরোধ, তোমরা তোমাদের এই মহান ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং যাঁরা এই ভাষা রক্ষার্থে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করবে।

স্মর্তব্য যে, ব্রিটিশ আমলের চৌষট্টি হাজারি মন্ত্রী, খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন জিন্নাহ্ সাহেবের পদলেহনকারী, ব্যক্তিত্বহীন, মাকাল ফল একজন পুরুষ। তিনি ছিলেন, ভাগ্যের ক্রীড়নক। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জিন্নাহ্ সাহেব ইন্তেকাল করার পর, এই ভাগ্যবলেই তিনি হঠাৎ ক'রে সারা পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেলের পদাভিষিক্ত হন। এবং আর একজন অকালকুষ্মান্ড, জনাব নুরুল আমীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে খাজা সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। এবং পূর্বসূরি খাজা সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩৫টি আসনের উপ-নির্বাচন বন্ধ ক'রে দিয়ে গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে হত্যা করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন না। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে বাঙালিদের মাতৃভাষা হননের পশ্চিমাগোষ্ঠীর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গ'ড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপের মুখেই, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ই মার্চ, বিরোধী দলীয় নেতাদের সঙ্গে একটা লিখিত ওয়াদা-পত্রে স্বাক্ষর দান করেন যে, আইন-পরিষদের আসন্ন অধিবেষণে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে প্রস্তাব আনবেন। কিন্তু একমাসের মধ্যেই এই ওয়াদার বরখেলাপ ক'রে, তিনি তার চরিত্রের পরিচয় দেন। প্রথম থেকেই তিনি পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে, বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। আত্মস্বার্থ উদ্ধার ও সমস্যাসৃষ্টি ছাড়া তাঁর আর কোনো যোগ্যতা ছিলো না। ভাগ্যের চাকা আবারও ঘুরল। আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলেন, এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে খাজা সাহেব হলেন পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অপকীর্তিগুলির বর্ণনা করলে, তোমাদের মন ঘৃণা ও ধিক্কারে ভ'রে উঠবে। যেমনঃ (১) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি সাহেব পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকায় এলে, ২৪ ঘন্টার নোটিসে তাঁকে দেশ হ'তে বহিষ্কারে বাধ্য করেন। (২) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে হাজার হাজার নর-নারীর প্রাণসংহার করেন। (৩) বাঙালির প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষাকে হননের অপচেষ্টা ও উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা। (৪) নুরুল আমীনকে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ৩৫টি আসনের উপনির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে, গণতন্ত্রকে হত্যা করার অপচেষ্টা। (৫) নির্মম দমন-নীতির মাধ্যমে, মুসলিম লীগের ভাড়াটে গুন্ডা ও পুলিসবাহিনী দ্বারা ছাত্র-জনতাকে নির্মমভাবে প্রহার, জেল-জুলুম, হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব পাকিস্তান ও বাঙালি জনগণকে তিনি আপন করে নিতে পারেননি। এই বিমাতাসুলভ মনোভাবের জন্যই সেদিন কলকাতা, চব্বিশ-পরগণা, এবং ত্রিপুরা আমাদের হাত-ছাড়া হয়েছিল।

আদুরেরা,

আমার এই ক্ষুদ্র লেখাকে কোনোভাবেই তোমরা প্রবন্ধ বা রচনা হিসাবে ধ'রে নিও না। নিলে ভুল করবে। আমি শুধু তোমাদের বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে সম্যক্ একটু জ্ঞানদানের জন্যই সবদিক্ কিছু-কিছু টেনে এনে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমার এই ক্ষুদ্র লেখায় আনন্দ পেয়ে যদি তোমাদের কৌতূহলী মন বাংলা সাহিত্যের মুক্তাসাগরে সন্তরণ করবার প্রেরণা লাভ করে, তবেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব, এবং তোমাদের জন্য কিছু-কিছু লেখার চেষ্টা করব।

সহকারী পুস্তকসমূহঃ-

(স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী - বদরুদ্দিন আহমদ)
(বাঙ্গালী যুগে যুগে ১ম-খন্ড - নাজির আহমদ)
(বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য - আহমদ শরীফ)

সম্মেলনের ভিডিও

নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত ১ম বাঙ্গালী খৃষ্টান সম্মেলনকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় নিপুণ শৈল্পিক ছোয়ায় ভিডিও বন্দী করেছেন প্রবাসীর দক্ষ ফটোগ্রাফারগন। এই ঐতিহাসিক 'আনন্দমিলন'-এর ১ কপি (২টা ভিডিও) আজই অর্ডার করুন। কালের প্রবাহে এই আনন্দ মিলনই হবে আমাদের আনন্দ স্মৃতি।

মূল্য – ১ কপি (২টা ভিডিও) ২৫.০০ (পঁচিশ ডলার) মাত্র। চেক পাঠাতে হবে `PBCA' নামে।

চেক পাঠানোর ঠিকানা ঃ

PBCA P.O. Box-1258, New York, NY 10159
Phone (917) 767-4632, (646) 773-7790

'সর্বকণ্ঠী শত্রু ক্রোধ' এবং সুস্থ থাকা

নিকোলাস শৈলেন অধিকারী, লোমালিন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়া

আধুনিক বাংলা ভাষার জনক প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটা বইএর নাম 'আদর্শ লিপি'। বইটা বিগত প্রায় দু'টি শতাব্দী ধরে বাঙালী ছেলেমেয়েদের 'হাতেখড়ি'র জন্য আদর্শ বই ছিল। বড় কোন বইয়ের দোকানে এ-বই এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। শহরের ফুটপাতে বা গ্রামের হাট-বাজারে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। পেলে দেখা যাবে বইএর শেষের পাতায় এ-ধরনের সাবধান বাণী হাতে লেখার অক্ষরে লেখা আছে ঃ 'ক্রোধের মত শত্রু আর নাই।'

'ক্রোধ' বা সহজ বাংলায় রাগ বা খিটখিটে মেজাজ বা মাথা গরম সম্বন্ধে ধর্ম বইয়ের কয়েকটি কথা - 'ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হও, কোপ (রাগ) ত্যাগ কর, রুষ্ট (বদমেজাজি) হইও না, হইলে দুষ্কার্য করিবে।' 'ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না। সূর্য অস্ত যাইতে না যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক।' 'কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে।' 'যে ক্রোধে ধীর, সে বীর হইতে উত্তম।'

রাগ সম্বন্ধে আরো অনেক বইএর চিরন্তন বাণী থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, রাগ করা অত্যন্ত, আবারও যোগ করছি, অত্যন্ত ক্ষতিকারক। যেমনি শরীর তেমনি মনের জন্য। আপনার, আমার, আমাদের সন্তানদের এবং প্রতিবাসীর জন্য। পৃথিবীর সব মানুষের জন্য। অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১ম বিশ্বযুদ্ধঃ সময় জুলাই ২৮, ১৯১৪ থেকে নভেম্বর ১১, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাৎক্ষণিক কারণ ছিল, ইউরোপের সার্বিয়া দেশের সন্ত্রাসী যুবক গাব্রিয়েল প্রিসিপ কর্তৃক অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী দেশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফারডিনান্ড ও তার স্ত্রীকে গুপ্ত হত্যা করা। ফলে যুদ্ধ। দুই দেশের পক্ষে বিপক্ষে যোগ দেয় আরো অনেক দেশ। ফল হলো- অনেক সৈনিক ও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু। আর হিসাব কষে দেখা গেছে তখনকার মুদ্রায় দু'হাজার এক শত ষাট কোটি ডলারের অপচয়!

২য় বিশ্বযুদ্ধঃ বিশ্ব-ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ। সময় সেপ্টেম্বর ১, ১৯৩৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৫। টানা ছ'বছর! কারণ- হিটলারের জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড দখল। অবশেষে এক লক্ষ দশ হাজার লোকের মৃত্যু। অভাব, ক্ষুধা, হাহাকার।

১৯৭১ এর বাঙালী জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সম্বন্ধে চল্লিশ এর উর্দ্ধ-বয়সীরা প্রায় সবাই জানেন। কারণ- ঐ ক্রোধ! জেনারেলদের জাত-ক্রোধ লক্ষ্য করা গেছে আইয়ুব থেকে ইয়াহিয়া পর্যন্ত। 'ভাত-খাওয়া' বাঙালীদের নেতা, ভোটে জয়ী শেখ মুজিবের হাতে প্রধান মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ ক্রোধে উন্মত্ত নেতা-জেনারেল-প্রেসিডেন্টরাই সাধারণ লোকের 'শান্তি' ছিনতাই করে নিয়ে নেয়। ঐটা এক ধরণের 'পশুদের আনন্দ'। ফলে- 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না।' সূর্য সৈনিকেরা, যারা চলে গ্যাছে, তারা কি আর ফিরে আসবে?

খ্রীষ্টের জন্মের আগে গ্রীস দেশের লেখক ঈশপস্- এর মর্মবাণী প্রচারের গল্পের মত একটা গল্প মনে পড়ছে। বৃটিশ আমলের জমিদারবাড়ী। কোন এক পূজা-পার্বনের উপলক্ষে গানের আসর বসেছে। নামকরা গায়কেরা গান গেয়েছেন। তবলা সংগত করেছে নিম্ন বর্ণের এক বাদক। তবলার মিষ্টি বোল শুনে সবাই খুশী। জমিদার ত' মহা খুশী। ছোট এক বিরতির সময় ভরাট গলায় বললেন, 'ওহে, তোমার নামটা কী?'

"আজ্ঞে, আমার নাম ছিরিনাথ (শ্রীনাথ) সর্বকণ্ঠী।"

জমিদার অবাক- 'হু, সর্বকণ্ঠী। অনেক পদবী জানা আছে আমার। কই, সর্বকণ্ঠী পদবী শুনি নি তো কখনো?"

"আজ্ঞে, আমরা সব্বাইর কণ্ঠে থাকি বুলেই এই পদবী। ধরুন গিয়ে, আপনার কণ্ঠেও আমি আছি।"

রক্ত-চোখ পাকিয়ে জমিদার বললেন, "কী আবোল-তাবোল বকছ হে। পাগল-টাগল হয়ে গেলে নাকি?"

"হুজুর, এই তো আপনার কোলে উঠিছি। কণ্ঠে উঠতি তো বেশী দেরী নেই কো।"

হুংকার ছেড়ে জমিদার বললেন, "এ্যাই, কে আছিস? এই বেয়াদবটাকে কান ধরে জলসা থেকে বাইরে বার করে দে তো!'

শ্রীনাথ উঠে দাঁড়িয়ে, মাথা নুইয়ে, জোড় হাতে বলল, "অপরাদ নেবেন না রাজামশাই। সাধুজন বইলে থাকেন, রাগ হচ্ছে গিয়ে চন্ডাল। এ পিরথিবীতে এমন একজনও নেই, যার রাগ নেই। এ শত্তুরকে কেই জয় করতি পারে নি কো। আমি ঋষি- পশুর চামড়ার ব্যবসা করি খাই- মাইনে আমি চন্ডাল। তাই সবার কণ্ঠে আছি বলেই আমি 'সর্বকণ্ঠী'।"

সবাই চুপ। পিন-পতন স্তব্ধতা। শ্রীনাথের চোখের দৃষ্টি তার পায়ের কাছাকাছি। ওদিকে জমিদারের রাগ তরল হতে হতে একেবারে বরফ-শীতল। উল্লাসিত কণ্ঠে বললেন, "আরে, বস হে। ভালো করে বাজাও, আরো একটু গান-টান শুনি। একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি। আজ তুমি আমার চোখের আর একটা পর্দা খুলে দিলে শ্রীনাথ।" সাবাস জমিদারমশাই।

যখন আমরা খোশ মেজাজে থাকি, আপনি, আমি চাইব না রাগারাগির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ি। রাগ প্রকাশে শরীর ও মনের দিক থেকে কতকগুলো তথ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। একেবারে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। আর প্রায় কুড়ি শতাংশ লোক একেবারে গো-বেচারা। বাকীরা মধ্যমপন্থী। অর্থাৎ তাদের মেজাজ এই একটু গরম, আবার পরক্ষণেই মাঘের জলের মত ঠান্ডা। তবে সবার ভাগ্য ভালো। রাগ-বিশারদরা বলেন, রাগের মাত্রা কতটুকু উঠলে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে, তা কেউ সঠিকভাবে জানেন না।

দুই, মহিলাদের মধ্যে যারা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন না, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের শরীর ওজনে ভারী থেকে ভারী হতে থাকে।

তিন, মাথা-গরম, লোকেরা প্রায় সব ধরণের রোগ-পীড়ায় ভোগেন। বেশী বেশী খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এরা স্বাভাবিক ধূমপায়ীদের চেয়ে বেশী ধূমপান করেন। রাগের সময় এদের 'চেইন স্মোকিং' (এক সিগারেটের আগুনে আর একটা জ্বালানো)- এর প্রবণতা বেড়ে যায়। এরা বেশী মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন। রেগে গেলে 'করেঙ্গে' বা 'মরেঙ্গে' ভাবটা চোখে মুখে ফুটে ওঠে। ফলে 'হার্ট এটাক'-এ আক্রান্ত হতে পারেন সহজেই।

চার, রাগের সময় স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে বলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। তখন রাগ চেপে যাওয়াও ঠিক নয়। তখন অবস্থাটা এমনি হয়- মোটরগাড়ীর চলার বেগ বর্তমান, কিন্তু ড্রাইভারের পা ব্রেকের ওপর চেপে বসছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হার্ট ডিজিস থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত গড়াতে পারে। 'ক্রোধ' বা মেজাজ তাই 'শাঁখের করাত'- আসতে ও যেতে দু'দিকেই কাটে।

'ক্রোধে ফেটে পড়ে' এমন কিছু গোঁড়া, কুসংস্কারাবদ্ধ, ধর্মান্ধ ও পাগলাটে লোক, ইতিহাসে ছিল, এখনো আছে। এরা জাতিভিত্তিক সাম্প্রদায়িক, ধর্মভিত্তিক, বর্ণবিদ্বেষমূলক হানাহানি ও রক্তপাত ঘটায়। ক্রোধে প্রায় অন্ধ হয়েছিল- ইয়াহিয়া খান, হিটলার, আওরঙ্গজেব, চেঙ্গিশ খান, হালাকু খান, সম্রাট নীরো, অশোক। এমনি আরো অনেকে। শেষোক্ত জন ছাড়া সবাই ইতিহাসে খল-নায়ক। রক্তলোলুপ। মানুষের কাছে ধিকৃত। অশোক ক্রোধের রাশ টেনে, ধর্মে অনুরাগী হয়ে, মানুষকে ভালবেসে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, রেগে গেলে 'ধীর-স্থির' হওয়াটা সবচে বড় ওষুধ। তারা আসলে বলতে চাইছেন, রাগ প্রকাশের ক্ষেত্রে 'ধৈর্য্য ধরা' বলে একটা কথা আছে। এটা মনে রাখলে শেষে পস্তাতে হয় না। স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সন্তান, বড় সাহেব-ছোট সাহেব, এমনকি প্রতিবাসীর সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মামলা-মকদ্দমা বা রাগারাগির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পরিণতির খারাপ দিকটার কথা চিন্তা করে কেউ যদি 'আর রাগ করব না' বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেন, তিনিও তার কথা রাখতে পারবেন না। পারবেন শুধু রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে।

রাগ দমন, নিয়ন্ত্রণ যা-ই বলুন, এখানে অবশ্য করণীয় দুটি তথ্য ভালভাবে মনে রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে লিখে ব্যক্তিগত টেবিলের বা জায়গার পাশে, চোখে পড়ে এমনভাবে রাখতে হবে। তথ্য দু'টি সহজ। কিন্তু পালন করা কিছুটা কষ্টসাধ্য। এক, অন্যকে (প্রতিপক্ষ) মন দিয়ে শুনতে হবে। দুই, কথা বলতে হবে ধীরে ও নীচু স্বরে। তাহলেই কেবল রাগটাকে আয়ত্তে বা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। এজন্য যথেষ্ট অভ্যাসের প্রয়োজন হতে পারে।

এবার নীচে লেখা তিনটা উপায়ের যে কোন একটা চেষ্টা করে দেখুন। 'একবার না পারিলে দেখ শতবার' কথাটাকে এভাবে চিন্তা করুন- 'আমার লাকি নম্বর পাঁচ বা সাত বা অন্য কোন একক সংখ্যা'। ততবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? 'আমরা অভ্যাসের দাস' এটা কিন্তু চিরন্তন সত্য। আচ্ছা, এবার উপায়গুলো হচ্ছে ঃ

এক, রাগারাগির ব্যাপার-স্যাপার ঘটলে 'SOS' শব্দটা মনে রাখুন। বিপদে রেডিও-টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সাহায্য পাওয়ার সংকেত হচ্ছে 'SOS'

১. (S for Silence) অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি সম্ভব হয়, চুপ করে থাকুন। অথবা-

২. (O for Overlook) আপাততঃ পরিস্থিতি ভুলে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরেফিরে আসুন। অথবা-

৩. (S for Seven) সাত সেকেন্ড পর্যন্ত মনে মনে গুণতে থাকুন।

অবশ্যই লক্ষ্য করে দেখবেন, রাগের মাত্রাটা কিছুটা হলেও নীচের দিকে নেমে এসেছে। নিজের ওপর আস্থা রাখুন।

দুই, আপনার দিক থেকে রাগের ব্যাপারটা ঘটার অর্থাৎ রাগ প্রকাশের ঠিক আগের মুহূর্তে নীচে লেখা ৩টি প্রশ্ন খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে করে দেখুন। মনে রাখুন, আপনার বাঁ দিকে 'হ্যাঁ' এর বাক্স, ডান দিকে 'না' এর বাক্স। আপনার প্রতি উত্তর মনে মনে বাক্সে ফেলুন।'

১. আমার জন্য রেগে যাওয়াটা কি খুব দরকারী? হ্যাঁ না

২. শরীরের বর্তমান অবস্থা থেকে কি আরো ভালর দিকে যাচ্ছি? হ্যাঁ না

৩. এতে কি খুব একটা লাভ হবে? হ্যাঁ না

যে কোন একটা প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে বুঝতে হবে রেগে ওঠা যাবে না। স্বাভাবিক হতে হবে। রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

তিন. এ পদ্ধতি অনেক সহজ এবং বেশ ভাল ফল দিতে পারে।

যখনই রাগের ব্যাপার ঘটবে বলে ভয় করছেন, তখনই-

১. মেরুদন্ড সোজা করে একটা চেয়ারে বসুন, এবং-

২. চোখ দুটো সম্পূর্ণ বন্ধ করে ছেলেবেলার/যৌবনের একটা সুন্দর ঘটনার কথা ভাবুন ও সংগে সংগে মনের তুলিতে ছবি আকুন, এবং-

৩. নাভির কাছ থেকে (লেখককে পাগল ভাববার দরকার নেই) সাত বার লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে ও প্রশ্বাস ফেলতে থাকুন। এ ক'টি কাজ এক মিনিটে শেষ করুন। সফলতা এলে নিজেকে 'সাবাস' দিন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, আপনার সফলতা অনেক রোগ-পীড়া থেকে আপনাকে দূরে রাখবে।

আসলে 'লাগসই' বা সঠিক উপায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা প্রথম দিকে হয়তো কিছুটা কঠিন মনে হবে। আবার ইচ্ছে হলে বা মনটাকে দৃঢ় করলে সহজও হতে পারে। কারণ লাভ-ক্ষতির দিকটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি। কিন্তু ঠিক সময়ে ভুলে যাই। তাই ঘরে বসে একাকী যে কোন পদ্ধতি নিয়ে অভ্যাস করুন, আর সঠিক সময়ে কাজে লাগান। নিজে নিজেকে উৎসাহিত করুন। দু'টো কথাই ঠিক- যেমন 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন', তেমনি 'সুস্থ মনে সুস্থ দেহ'।

প্রভু যীশু যিরূশালেম মন্দির অপব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। চাবুকের মত দড়ি ব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের জিনিষপত্র ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করেছিলেন। বায়ুর বেগে সমুদ্র অশান্ত হলে তিনি 'ধমক' দিয়ে পরিবেশ শান্ত করেছিলেন। 'ক্রোধ' নামক পশুটাকে আমরাও চেষ্টা করলে ধমক দিয়ে অথবা যে কোন একটা উপায়ে শান্ত করতে পারি।

উপসংহার ঃ 'প্রত্যেক জন শুনতে তৎপর, কথায় ধীর ও ক্রোধে ধীর হোক, কারণ মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না। (বাইবেল) যাকোব ১ঃ১৯ পদ। ['Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires.' James 1:19]

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বড়োদিন সুন্দর ও সার্থক হোক।

এই হতশ্রী সময়ে

ডঃ ক্যাথেরীনা রোজারিও, ফ্লোরিডা

গতকাল আমার এক প্রাক্তন সহকর্মীর চিঠি পেলাম সিলেট শাহ্‌জালাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমি সমাজ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক এবং তিনি সমাজকর্মের সহকারী অধ্যাপক তদুপরি প্রায় কাছাকাছি সময়ে শিক্ষকতায় যোগ দেয়ায় আমাদের সম্পর্কটা সহজ ছিল। ভদ্রলোক অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধায় বেশ কোনঠাসা অবস্থায় রয়েছেন এবং তাঁর চিঠিটি ইঙ্গিত করছে যে এতোদিন যাঁকে/যাঁদের আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক নয় বলেই জেনেছেন তাদের আচরণ ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে তার কাছে।

শান্তিপ্রিয় আমার এই সহকর্মীর ব্যাকুলতায় আমি ব্যথিত হলাম। কিন্তু চিন্তিত হলাম আরো বেশী। ইদানীং পত্র পত্রিকান্তরে জানছি দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার সরকারী দল দাবী করছে যে এটি বিরোধী দল কর্তৃক অতিরঞ্জিত প্রচারণা। বি.বি.সি রেডিওতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের সাক্ষাতকার শোনাল বেশ ক'টি। স্বাভাবিক ভাবেই বেশ চিন্তি ত আছি। আমার শৈশবের এক সুশিক্ষিত বন্ধু নিউইয়র্কে থাকে, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল টেলিফোনে, জানালাম সেই সহকর্মীর কথা, আমার দুঃশ্চিন্তার কথা। বন্ধুটি বেশ জোর গলায় বললো, হতেই পারে, এ আর নতুন কি? কথাটা খচ্ করে ভেতরে গেঁথে গেলো। সত্যিই এ আর নতুন কি? ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা আগেও ঘটেছে।

আমি সাম্প্রতিক ঘটা বা না ঘটা কাহিনীগুলোর চেয়ে যে বিষয়টিতে মনোযোগী হলাম, তা'হলো- নতুন করে কি ঘটলো যাতে সংখ্যালঘুরা এতখানি আতঙ্কিত?

যে কথাটা আমরা বলছি না এড়িয়ে যাচ্ছি তা'হলো- শুধু সংখ্যালঘু নয় দেশের অনেকেই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে গত নির্বাচনের পর থেকে। না, বি এন পি-র জয় মেনে নিয়েছে জনগণ এর আগেও। পার্থক্যটা হলো জামাত ইসলামীর মন্ত্রিসভায় অন্ত ভুক্তিকরণ, চিন্তিত করেছে আমার মতো আরো অনেককেই। আওয়ামী লীগ বলুন, বি-এন-পি বলুন জামাতের সঙ্গে আতাঁতে কেউই কার্পণ্য করেনি। কিন্তু খোদ জনগণ জামাতের উত্থানে চিন্তিত। আমরা দেখেছি এই ঘাতকদের সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে, দেখেছি মায়ের অসুস্থতার অজুহাতে গোলাম আজমের দেশে প্রবেশের এবং রাজনীতি করার অনুমতি পেতে। সবই ঘটেছে খানিকটা অন্তরালে কিন্তু এবারে প্রকাশ্যে তারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারেরই অংশ। মন্ত্রীসভার বাইরে থেকে জামাতের 'আস্ফালন' আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সরকারে অন্তর্ভূক্তিকরণে, সরকারী পর্যায়ে মৌলবাদী আঘাতের প্রতিকার করা হবে না এটি বলাই বাহুল্য। কোনো আমলেই তা'খুব একটা যে হয়েছে তা' নয়। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে দক্ষিণাঞ্চলের একটি গীর্জায় বোমাবাজীতে প্রাথর্নারত মানুষ মারা গেছে। বলা হয়েছে এটি আন্তঃদলীয় কোন্দলের জের। ক'দিন আগে ইত্তেফাক (ইন্টারনেট সংস্করণে) দেখলাম পূঁজোর আগের দিন মন্দিরে ঢুকে মুর্ত্তির মাথা ভেঙে রেখে গেছে। বলা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ কোন্দল। সুতরাং সরকারী পর্যায়ে মৌলবাদী আচরণের বিচার হয়েছে বলে শোনা যায়নি কোনো সরকারের আমলে, তবে এবারের বিষয়টি ভিন্ন কেননা যারা মৌলবাদী সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা দেশটিকেও নিয়ন্ত্রণ করছেন।

যশোরের বোমা হামলায় বেঁচে যাওয়া এক সঙ্গীত শিল্পী তার পরবর্তী অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেঅ "দাদা, ওরা কি আমাদের বাঁচতে দেবে না।" প্রশ্নের উত্তর দেয়নি কেউ, প্রশ্নটা হাওয়ায় মেলাবার আগেই দু'মাসের ব্যবধানে আরেকটি বোমা হামলায় এই সঙ্গীত শিল্পীটি হারিয়ে যান।

মানুষ কোথায় পালাবে? শুনেছি, যে যত বড় মানুষ তার লুকোনোর জায়গা তত কম। কিন্তু গ্রামের এই নিরীহ মানুষগুলো তো বড় কেউ নন তবুও তারা বাঁচতে পারছে না। আমরা এসব বর্বোরোচিত হামলায় চোখের জল ঝরাচ্ছি। কিন্তু যে চোখে অশ্রু ঝড়ে সেতো স্বপ্নও দেখতে চায়।

আমি কোনো দল করি না। আমি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম, এখানে সরকারী চাকুরী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন সকল নির্লিপ্ততাকে প্রশ্রয় দেবার প্রশিক্ষণ আমার আছে। তারপরেও শীতল রক্তে অশান্তির টের পাই। আমাদের মধ্যবিত্তের এই সমস্যা- সমাজের ফাঁকফোকড়গুলো সহজেই চোখে পড়ে - অশান্তি দানা বেঁধে অসন্তোষ হয় কিন্তু পরিবর্তন করতে পারি না কিছুই। পজিটিভলি বললে, আমরা উৎকণ্ঠা ছড়াই না, উত্তাপ ছড়াবার চেষ্টা করি।

কিন্তু সত্যিই কি পরিবর্তন করতে পারি না কিছুই? এটি কোনো রাজনৈতিক লেখা নয়। ঐ যে বললাম - আমাদের কষ্টটা এখানেই যে আমরা কষ্টগুলো সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াই। আমি জানি দেশের জন্য প্রচন্ড মমত্ব বোধ নিয়ে আমরা অনেকেই দেশে বিদেশে অবস্থান করছি। আমরা অনেকেই ভাবছি -এই যে মৌলবাদের স্বরূপ দিনে দিনে উন্মোচিত হচ্ছে -আমরা মনে প্রাণে তা' ঘৃণা করি। আমরা জানি ধর্মপালন আর ধর্মান্ধতা এক নয় -কোনো ধর্মই বোমার আঘাতে ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের জীবন নাশ সমর্থন করে না।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় নি। যারা আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করি তাদের সংখ্যা এখনো প্রচুর। শুধু প্রয়োজন সচেতন মানুষের একাত্মতা আর সহনশীলতা। যার যেটুকু গতিবিধি তাতে নিজের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটানো। আমি খ্রীষ্টিয় পরিবারে জন্মেছি, প্রতি রোববারে গীর্জায় যাই - ভালো কথা, তাই বলে পারিবারিক আলোচনায় ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী না বলে 'মুসলমান' হিসেবে উল্লেখ করা সাংঘাতিক কুপমন্ডুকতা। সব বিষয়কে বুঝতে হবে বহুমাত্রিকতায় না হলে এক চোখা দৈত্য বনে যেতে হবে।

এক ঘরোয়া মজলিশে কথা হচ্ছিল- তাতে বীরোত্তম মিঃ আর. দত্ত-ও আছেন। এক প্রতিবাদী পুত্র বলছিল, উদারতা নিয়ে - যে সব ধর্মকে সমান করে দেখা, যুক্তি দিয়ে বোঝার কথা। ভদ্রলোকের বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন- ওরা উদার না হলে তুমি একা হবে কেন?

কি আশ্চর্য্য যুক্তি। মনে পড়লো কপালকুন্ডলার সেই, "তুমি অধম হইলে আমি উত্তম না হইব কেন?" কথাটি। ঘৃণা প্রসঙ্গে বলি- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমাজ মনোবিজ্ঞান পড়াই- সেদিন পাঠ্যসূচী "মনোভাব পরিমাপ"। বললাম ছাত্রছাত্রীদের- তোমরা নিজের নাম না উল্লেখ করে কাগজে লেখো- যেদিন প্রথম অন্য ধর্মের মানুষ দেখলে কি মনোভাব হলো। পাঠক বিশ্বাস করুন- এই ১৭/১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি যে তীব্র ঘৃণা দেখলাম, তা' শিহরিত হবার মতো। কেউ কেউ উদারতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু অনেকেই বন্ধুনিষ্ঠ কারণ ছাড়াই প্রচন্ড বিরুপ মনোভাব দেখিয়েছে। চেষ্টা করেছি পরবর্তী লেকচারে এ সব ভুল ভাঙতে- জানি না কোন ছাপ ফেলতে পেরেছিলাম কিনা।

আসলে নতুন প্রজন্মের কাছে কি শিক্ষা দিচ্ছি আমরা, পারিবারিক প্রয়োজনে তা ভেবে দেখা উচিত। মাষ্টারদা সূর্যসেনের মতো কি বলতে পারছি 'তোমাদের জন্য সুন্দর একটা স্বপ্ন রেখে যাচ্ছি।' স্বপ্নরা মরে না - অমর হয়? বোধহয় পারছি না। আমি দেখেছি বহু পরিবারে অন্য ধর্ম থেকে শুরু করে আঠার গ্রাম না ভাওয়াল এই বিভাজনও টানা হয়। ভাংতে ভাংতে আর কত ক্ষুদ্র করব আমরা আমাদের। এতো দূরে, এতো বিশালত্বের মধ্যে এসেও যদি সেই গ্রামের পরিচয়ে আত্মসুখ পেতে চাই- এর চেয়ে কাঙ্গালপনা আর কি হতে পারে? বেশ ক'বছর আগে চানক্যসেনের 'পুত্র পিতাকে' পড়ছিলাম। তাতে পুত্র শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছে পিতাকে প্রশ্ন করছে- কেন তার পিতা বাড়ীতে তার মুসলমান বন্ধু এলে সাংঘাতিক আতঙ্কে কাটাতো, কেন বাচ্চাদের তড়িঘড়ি লুকিয়ে রাখা হতো, মা কেন আগলে রাখতেন যেন সাংঘাতিক কোন বিপদ ঘটতে চলেছে। কেন মগজের কোষে কোষে গেঁথে দেয়া হয়েছিলো - অন্য ধর্মের মানুষ মানেই সন্দেহের চোখে তাকাতে হবে?

সন্দেহের চোখে আমাকেও তো দেখেছে মানুষ। মুদ্রার অন্য পিঠে আমিও আছি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলে আমাকেও কি অন্য চোখে দেখে নি মানুষ? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিসি প্রফেসর বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর বলেছিলেন- কেবল আমরা যারা ভিন্ন চিন্তা করি আমরা সবাই সংখ্যালঘু, তাই শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না- আপনার দলে আমি আছি। না, তিনি নেই। কারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে বিরূপ মনোভাব তাকে দেখতে হয়নি, হয়না। আমার প্রাক্তণ সহকর্মী ডঃ জাফর ইকবাল সংখ্যালঘুদের কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করেন কিন্তু আমার জায়গায় তিনি দাঁড়াতে পারেন না। মনে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ চলছে। আমি দায়িত্বে রয়েছি, মঞ্চে আমার অবাধ গতিবিধি। হঠাৎ করে হাম্‌দ প্রতিযোগীতা শুরু হলে আমায় তড়িঘড়ি করে মঞ্চের পেছনে নিয়ে আসা হোল- কারণ বোধ করি আমার ধর্ম আমার 'মহিলা' পরিচয়। সঙ্কুচিত হলাম আমার অস্তিত্ব নিয়ে- অনুভূতিটা কেমন বোঝবার চেষ্টা করি। আপনারা নিশ্চয় মতিঝিল অফিস পাড়ায় কোনো বহুতল বিশিষ্ট অফিসে গেছেন। লক্ষ্য করবেন, এই সব অফিসে লিফট্ পরিচালনার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি মহা বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞেস করেন- ক'তলায় যাবেন এবং ততোধিক নিলিপ্ততায় কোন রকমে ডান হাতটি তুলে সেই তলার বোতামটি টিপে দেন। এই-ই হচ্ছে তার চাকরী। তার এই বোতাম টেপার ওপর নির্ভর করেই আপনি হাল ছেড়ে বসে থাকেন এবং লক্ষ্য করেন তার হাতের গতিবিধি। এমনি সময়ে কোনো মহিলা লিফটে উঠলে ব্যক্তিটি অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। এই অভিজ্ঞতা আমি জানি, অনেক মহিলার এবং অনেক সচেতন পুরুষও ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন।

লিফট্‌ম্যান এতো চিন্তিত হয়ে পড়েন এই মহিলাটিকে কোথায় দাঁড় করাবেন এই নিয়ে। মহিলাটিকে ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডানে, সামনে থেকে পেছনে, পেছন থেকে সামনে নড়িয়ে, সরিয়ে তিনি হাঁপিয়ে যান। আর যাকে নিয়ে এই ঘটনা সে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে শরমে মরে যায়। আমিও ঠিক তেমনি আমার অস্তিত্ব নিয়ে সংকোচে থাকি। কিন্তু এতো নতুন নয়। সঠিক শিক্ষা নেই বলেই অন্য ধর্মের মানুষকে অন্যভাবে দেখার শিক্ষা পেয়েছে সাধারণ জনগণ।

এমনি কত ঘটনা- আদমশুমারী করতে আসা অফিসার আমাদের জাতি না বলে উপজাতি বলেছেন। আমার প্রতিবাদী বাবা তাকে বাইরে বেরিয়ে যাবার দরজা দেখিয়ে চীৎকার করে বলেছে- "মটরশুঁটি পরিমাণ বুদ্ধি নিয়ে কাজ করেন কেন?" আজো আমাদের চীৎকার করে বলতে হচ্ছে- আমরা বাঙালী খ্রীষ্টানরা বাঙালী জাতি- উপজাতি নয়। আমার এক শিক্ষক যাকে উদার বলে জানতাম আমায় বলেছে-

ভালো- প্রথম খ্রীষ্টান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবে- মেইন স্ট্রীমে চলে এলে তুমি। আমার এক সহকর্মী বলেছে- শাড়ী, টিপ আর লম্বা বেনীর এই আমি কি করে খ্রীষ্টান হই। সে পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেই। জানি না সে ছাত্রদের কি শিক্ষা দেয়। কি স্বপ্ন দেখায়।

কথা হচ্ছিল কবি অসীম সাহার সঙ্গে নীলক্ষেতে তার 'ইত্যাদি' প্রেসে বসে। বলছিলেন বাবরী মসজিদ ভাঙার দিন তিনি আর কবি নির্মল গুণ কিভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে ঘরে ফিরেছিলেন- বলছিলেন- 'তাঁর বাবা মারা যাবার পর, তখনো মৃত দেহের সৎকার হয়নি - এমনি সময়ে আশেপাশের লোকজন বলা শুরু করেছিলো "তাহলে তোমরা তো এবারে ওপারে চলে যাচ্ছো তাই না"। অসীম সাহা নীরব চীৎকারে বলেছিলেন - এই শহরে তার বড়ো হওয়া, প্রথম কবিতা লেখা, প্রথম মঞ্চে দাঁড়ানো, এ মাটি তার। কেন ছেড়ে যাবেন তিনি সব পাট চুকিয়ে। বললেন- "১৯৮৯ এর ঘটনার পর থেকে যে কবিতায় হাত দিয়েছেন দেখেছেন "উদ্বাস্তু" শব্দটা কেমন করে যেন কলমের ডগায় চলে এসেছে। অসীম সাহার কথা শুনে মনে হয়েছিল "উদ্বাস্তু" শব্দটা অনেককেই তো ভোগায়।

ধর্মকে ইস্যু করে দেশ ছেড়েছেন অনেকেই। সত্যও আছে তাতে, মিথ্যেরও প্রভাব আছে। আমি প্যারিসে ল্যুভ মিউজিয়ামের সামনে সুশান্ত মজুমদারকে কাঠের খেলনা ফেরী করতে দেখেছি- আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছেন- আসল নাম সুলতান আহমেদ, ভিন্ন নামে আশ্রয় পেয়েছেন। আমি নেদারল্যান্ডে মোহাম্মদপুরের মুন্নাকে দেখেছি "আবু" নামের রোহিঙ্গা সেজে আশ্রয় পেতে। আমি বেলজিয়ামে দেখেছি তসলিমা নাসরীনের সাথে ছবি তুলে অ্যাসালাইম পাওয়া ব্যক্তিকে।

লক্ষ্য করুন, এরা কোন একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘটনা সাজাচ্ছেন। ঘটনাগুলো সত্য নাও হতে পারে কিন্তু ইস্যুগুলো অসত্য বলি কি করে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই, সারা বিশ্বে আজ যখন ধর্মীয় বিভাজনের অশুভ সংকেত শোনা যাচ্ছে, তখন কি উচিত নয় সচেতন মানুষের বিষয়টিতে মনোযোগী হওয়া। যত ক্ষুদ্রই এর পরিসর হোক অন্য মানুষ যতই অধম হোক - আমরা কি উৎস হবার চেষ্টা করতে পারি না। খানিকটা পড়াশুনো করা অন্য মত সম্পর্কে, খানিক জানা, এ সবের চর্চা তো করতে পারি। আমি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনোর কথা বলছিনা। একাডেমিক শিক্ষাই চূড়ান্ত শিক্ষা আমি তা মনে করি না।

প্রসঙ্গক্রমে বলি - আমার পি এইচ ডি গবেষনার জন্য এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধানের কাছে গিয়েছিলাম কিছু উপাত্তের জন্যে। ভদ্রলোক আমার নাম জানতে চাইলেন, জিজ্ঞেস করলেন- কোন দেশের আমি। বাংলাদেশ শুনে বললেন - ও তাহলে - আরবী জানো নিশ্চয়, মুসলিম নিশ্চয়। হায় হতোস্মি!

সে কারণেই বলছি একাডেমিক শিক্ষাই যে মাপকাঠি - তা নয়। শেষ কথা- ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে আমাদের তৈরী করেছেন। তাঁর পতাকা ওড়াবার দায়িত্ব দিয়েছেন। "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার দাও শক্তি"। তাঁর পতাকা আমাদের হাতে, তাকে বহন করার শক্তি আমাদের মেধায় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বোধকরি বার বার আমরা পিছিয়ে পড়ছি - পতাকা হাতে এগিয়ে যাবার তাগিদ অনুভব করছি না।

পৃথিবীকে পরম সত্য আর মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জেনে সচেতন মানুষ একাত্ম হবার সময় বোধ করি এখনই।

সম্মেলনের ভিডিও

নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত ১ম বাঙ্গালী খৃষ্টান সম্মেলনকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় নিপুন শৈল্পিক ছোয়ায় ভিডিও বন্দী করেছেন প্রবাসীর দক্ষ ফটোগ্রাফারগন। এই ঐতিহাসিক 'আনন্দমিলন'-এর ১ কপি (২টা ভিডিও) আজই অর্ডার করুন। কালের প্রবাহে এই আনন্দ মিলনই হবে আমাদের আনন্দ স্মৃতি।

মূল্য - ১ কপি (২টা ভিডিও) ২৫.০০ (পঁচিশ ডলার) মাত্র। চেক পাঠাতে হবে `PBCA' নামে।

চেক পাঠানোর ঠিকানা ঃ

PBCA P.O. Box-1258, New York, NY 10159

Phone (917) 767-4632, (646) 773-7790

সুখ

শিউলী গমেজ (পাচু), নর্থ কেরালাইনা

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, মিতার এই সকালে শুয়ে থাকার কোন অভ্যাস নেই, তবুও আজ সকালে ওর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। কেন যেন আজ ওর বাইরে যেতে মন চাইছে না। আরমোড়া ভেঙ্গে মিতা বিছানায় উঠে বসলো। ওর চোখ দুটো বাইরে জানালা ভেদ করে দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে যেন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে। ওর মনটা চলে গেল বহুদিন আগের এমনি এক বৃষ্টি ঝড়া দিনে।

মিতা সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছে। সবকিছু নতুন, শুধু দুইতিন জন মেয়ে ছাড়া, সব ছাত্র ছাত্রীই ওর অপরিচিত। নতুন স্কুল, নতুন টিচার ও নতুন বন্ধু-বান্ধবী সব মিলিয়ে ওর মাঝে যেন কেমন ভয়, আনন্দ ও উদ্দেগভরা এক মন। এরই মাঝে একদিন সকালে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ করে আকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। ও কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। এমনি সময় একজন ছেলে এসে বললো, "যদি কিছু মনে না করেন তবে ছাতার ভিতরে এসে দাঁড়াতে পারেন"। মিতার তখন ভাববার সময় ছিল না। ও ছাতার ভিতরে ছেলেটির পাশে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এসে গেল ওরা বাসে চড়ে পাশাপাশি বসল। মিতা ছেলেটিকে বললো, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে"। ছেলেটি উত্তরে বললো, "ও কিছু না", এই পর্যন্তই সেদিন।

বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা, সেদিনও মিতা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে পাশে থেকে সেই কণ্ঠস্বর কেমন আছেন?

ও সৈকতের কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললো "তোমাকে ভালবেসে পেয়েছি স্বর্গ, তোমাতে সব সুখ, তোমাতে মোর অর্ঘ্য"।

"একটু জেনে নিন"

* ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না, কারন তাতে আপনি অচিরেই অক্ষম হয়ে যাবেন।
* হাসি মুখে থাকুন, কিন্তু বেশী হাসবেন না, কারন সেটা কান্নার আমন্ত্রন মাত্র।
* দান করুন, কিন্তু বেশী করবেন না, কারন তাতে আপনাকে পর্যায়ক্রমে দয়াপ্রার্থী হতে হবে।
* বন্ধুত্ব করুন, তবে সীমার ভিতরে, কেননা সীমার বাইরে শত্রুতার সৈন্যগুলো অপেক্ষা করে।
* মিষ্টিভাষী হউন পাত্রভেদে। কেননা অপাত্রে আপনার এ নিবেদন পরিহাস হতে পারে।
* সময়ের সদ্ব্যবহার করুন রীতিমত, কেননা মৃত্যু আপনাকে হাতছানি দিচ্ছে প্রেমিকের মতো।
* নিয়ম মেনে চলুন। কারন অনিয়মের ভার বহনের মত ক্ষমতা আপনার নেই।
* রাগ বেশী করবেন না, কারন রাগের অনলে সিদ্ধ হলে অন্যেরা আপনাকে সহজেই চাটনি বানাতে পারে।

- শিউলী গমেজ (পাচু), নর্থ কেরালাইনা

"জেনে রাখা ভাল"

* মানুষের পরিচয় ব্যবহারে, মানুষ আত্মীয় হয়ে উঠে ঘনিষ্ঠতায়।
* যারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী তারা শিক্ষিত হলেও মূর্খ।
* যিনি সৎ চিন্তা করেন তিনি স্বর্গে বাস করেন।
* যে ব্যবহার জানে না, তার গর্ব করার কিছু নেই।
* সুন্দর অভ্যাসগুলি মানুষকে ভদ্র করে তোলে।
* মূর্খের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, সে তোমার উপকারের চেষ্টা করে তোমার ক্ষতি করে।
* যে সবচেয়ে বেশী দেয়, সে-ই সবচেয়ে বেশী পেয়ে থাকে।
* যার লজ্জা নেই, তাকে লজ্জা দেয়া মানে নিজেই লজ্জা পাওয়া।
* ভাল কাজ করা হলো মানুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।
* দোষগুণ ভুলভ্রান্তি মিলেই মানুষের জীবন। অন্যকে ক্ষমা করার মত মহৎ মন প্রত্যেকের থাকা চাই।
* শিক্ষা যে দান করে সে আলোর মানুষ, তা তার জীবন আলোকময় করে।
* কলেজ তোমায় শুধু পথ দেখিয়ে দেয়। সারা জীবন তোমায় দেখতে হবে, শিখতে হবে, জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

- সংগ্রহে ঃ তিলু বার্নাডেট গমেজ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

ঋতুর আনন্দধারা ও প্রবাসী

বিলাস রোজারিও, জার্সি সিটি, নিউ জার্সি

ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। দেশ সমূহ আবিস্কার করেছেন মানুষ। স্থল ও জল সীমারেখা নির্দিষ্ট করে এক একটি দেশের নামকরণ করেছেন পূর্বসূরী বিজ্ঞজনেরা। ঈশ্বর প্রদত্ত দিন ও রাতের মধ্যে সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত ব্যবধানের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সময়সূচিও নির্ণয় করেন তাঁরা। কাল বা ঋতুর নামগুলি যদিও মানুষের দেওয়া একই অর্থের একই নামের ঋতু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপ ধারণ করে। আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন রূপ দেওয়ার হাত এক মাত্র সৃষ্টি কর্তার।

ভারত বর্ষের ঋতুর বৈচিত্র্যের মাঝে বসন্তকে সেরা ঋতু বলে লিপিবদ্ধ করেছেন আমাদের কবিরা। বাংলাদেশে উত্তরের শীতল বায়ু বয়ে আনে শীতের আগমনী আমন্ত্রণ। শীত কালে গ্রাম গঞ্জের শস্য শ্যামলী জমিগুলি সেজে উঠে নতুন সাজে। নদী নালার গা ঘেষা কাঁশবনগুলি ধুসর সাদা ফুল ফুটিয়ে সাজিয়ে দেয় প্রাকৃতিক দৃশ্যকে। কোথাও কোথাও পল্লীবালারা দলবদ্ধ হয়ে শিশির ভেজা কচি শাকের ঢগা তুলার চমৎকার দৃশ্যও নজরে আসে। কোয়াশায় ঢাকা ঋতু পেরিয়ে মৌসুমী নামে ভোরের মিষ্টি হাওয়া বয়ে আনে সেরা বসন্ত ঋতুটি। গাছে গাছে নতুন পাতা গজায় তার ফুলের বাহার নিয়ে বাসন্তি রংয়ের শাড়ি পড়া নব বধুর মত সেজে উঠে শ্যামলী বৃক্ষগুলি। ঘুঁ ঘুঁ পাখির মত বিভিন্ন পাখিদের মনেও নীড় বাঁধার স্বপ্ন জাগে আর কোকিল তার সুমধুর ডাক শুনিয়ে বসন্তকে ভালবাসা জানায়। কোকিল কণ্ঠ শুনতে শুনতে মাথা উঁচু করে দাড়ায় কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল, স্বাগতম জানায় গ্রীষ্মকে আর গ্রীষ্ম বয়ে আনে কাল বৈশাখী।

শীত প্রধান দেশগুলিতে শীতকালে কচি ঘাসের ঢগা নজরে আসা দুরের কথা পাতাহীন বৃক্ষ তার শাখা প্রশাখা মেলে দাড়িয়ে থাকে। তুষার আবরণী দেশে মানুষের বাসাও যেন ঘোমটা বাঁধা। তাই শীত প্রধান দেশগুলিতে সুন্দর আনন্দময় দিনগুলি যেন এক গ্রীষ্ম কালেই, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা গ্রীষ্মের ছুটির প্রহর গুনে, অপেক্ষমান আকর্ষনীয় মনোরম স্থানগুলি পর্যটকদের সুস্বাগতম জানিয়ে সুনির্দিষ্ট করে দেয় সুগম পথ। সকল শ্রেণীর মানুষই যেন গ্রীষ্মের আনন্দ ভোগ বিলাসের পরিকল্পনায় মিলন ভালবাসা বিনিময়ের মণিকুঠায় তৈরী করেন মিলনকেন্দ্র। ঋতু চক্রের মত আমরাও অতীত পেরিয়ে বর্তমানকে বরণ করে আমেরিকায় পা রেখেছি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এসে পেয়েছি শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক একটি সংগঠন। যার নাম "প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন" তারই কার্যকারী পরিষদের মাধ্যমে বাংলার বৈশিষ্ট্যের কিছু আনন্দধারা যেমনঃ বড়দিনের পুর্নমিলণী, বার্ষিক বনভোজন, সম্মেলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালা উপহার দিয়ে আমেরিকাতেও বাংলার কৃষ্টিকে ধরে রেখেছে। সুপরিকল্পিত ভাবে এবৎসরেই উত্তর আমেরিকায় প্রথম সম্মিলনী দুই দিনের অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করে এসোসিয়েশন তার গর্বকে গৌরবের চূঁড়ায় স্থান দিয়ে মানুষকে দিয়েছে মনোমুগ্ধ আনন্দ।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল পাঠের পাশাপাশি আরতির ধুঁয়ায় ভেসে আসে কবি শামসুর রহমান রচিত "সুপ্রভাত বাংলাদেশ" আবৃত্তিটি। শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের সভাপতিতে মাননীয় প্রধান অতিথি ও জ্ঞানীগুনী বক্তাদের অমূল্য বক্তব্যে মনোগ্য প্রশংসা নিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে আসা গাংচিলের মত এক দল নৃত্য শিল্পী, তাদের নুপূরের ঝংকার দর্শকদের করেছে আনন্দিত ও মোহিত।

নতুন প্রজন্মের নতুন রূপ নিয়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দিনের নতুন অনুষ্ঠান মালা। আমাদের শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ সুন্দর মনে সুন্দর দৃষ্টিতে তারই দেওয়া প্রশ্নের উত্তরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা খ্রীষ্টান, আমরা বাঙ্গালী, আমরা বাংলা ভাষায় প্রার্থনা করি এটাই আমাদের গর্ব।

সাঁপুড়ে যেন দর্শকদের মনকে বন্দি করেছিল তার ভিমের আওয়াজে। নাগ নাগিনীর ওঝা সেজে "নাচ ময়ূরী" বেদের মেয়ে ও ঘুমটা পরা গাল টুক টুকে বৌটি ফেলে আসা দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে যেন মনটিকে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার লালিত সবুজ ঘেরা অরণ্যে। এমনই ভাবে আমাদের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি যেমন একটি সেতু বন্ধনের মত বেঁধে রেখেছে প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন। সম্মিলনী অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের উৎসাহে ছেলে মেয়েরা ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে নিজ নিজ ভূমিকায় গীতিমালা, নৃত্যাঞ্জলী, ইত্যাদি উপহার দিয়ে মন কেড়ে নেওয়ার দাবীদারে যেমন সোনালী আশ্ দিয়ে বেধে রেখেছে শ্যামলী স্মৃতির শিল্পকলাকে। আমেরিকার গ্রীষ্মকে নিয়ে গিয়েছে সেই দিনের পাশে, যেই দিনে বসন্তের কোকিল কণ্ঠ ছুয়ায় প্রাণে।